ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম : ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা ।। ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৬ ডিসেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে খারিজ বিহারবাসীর

সাফল্যের দুই মুখ– নীতিশ কুমার ও সুশীল মোদী

গুরুপুরুষ।। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার সাগরের ঢেউয়ের মতো একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ছে। যেমন টু জি স্পেকট্রাম বরাত দেওয়া, কমনওয়েলথ গেমসের বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ অথবা মুম্বাইয়ে কারগিল শহীদদের নাম ভাড়িয়ে বেআইনিভাবে গড়ে তোলা বহুতল আদর্শ আবাসনের বিলাসবহুল ফ্ল্যাট নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়া ইত্যাদি সব কিছুতেই সোনিয়া-মনমোহন দলের নেতারা যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে তাতে দেশবাসী স্তম্ভিত। কংগ্রেসের এইসব ভয়ংকর কেলেঙ্কারির প্রেক্ষিতে প্রথম ভোট হয়েছে বিহারে। সেখানে বিধানসভার নির্বাচনে আমজনতা তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যালটের মাধ্যমে জানিয়েছেন। সোনিয়া—মনমোহন —রাহুল গান্ধীরা বিহারের যে সব জেলায় জোরদার নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন সেখানেই কংগ্রেস (এরপর ৪ পাতায়)

লস্করের 'টার্গেট' হিন্দু তীর্থস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জার্মান বেকারীর রেশ কাটিতে না কাটিতেই এবছরের গণেশ চতুর্থীর দিন পুণেতে আরেকটি বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল লস্করের। প্রসঙ্গত, এবছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি পুণের জার্মান বেকারীতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল লস্কর-এ-তৈবা জঙ্গি সংগঠনটি। গণেশ চতুর্থীর দিন পুণের শ্রীমন্ত দাগদুশেঠ হালওয়াই গণপতি মন্দিরে এমনিতেই বহু হিন্দু পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। তাই বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য ওইদিন ওইস্থানটিকেই বেছে নিয়েছিল লস্কর জঙ্গীরা। জার্মান বেকারী হামলার ঘটনায় মহারাষ্ট্র অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এ টি এস) গণেশ চতুর্থী উৎসবের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে। পুণের মহাত্মা গান্ধী বাসস্ট্যান্ডের কাছ থেকে আটক হয় মীরজা হিমায়েত বেগ। নাসিকের সুভাষ চন্দ্র বোস মার্গ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় শেখ লালবাবা মহম্মদ হুসেন ওরফে বিলাল-কে। এর মধ্যে মীরজা বেগ পুণে বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত ছিল বলে সন্দেহ। অন্যদিকে নাসিকে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে অভিযোগ ছিল বিলালের নামে। এদের দু'জনকে গ্রেপ্তার করে গণেশ চতুর্থীর দিন পুণেতে হামলা করার ব্যাপারে লস্করের পরিকল্পনা করার কথা জানতে পারেন গোয়েন্দারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মহারাষ্ট্র এ টি এসের এক বরিষ্ঠ আধিকারিকের কথায়— "জার্মান বেকারী সহ পুণের মোট ৫টি জায়গায় লস্করের মহারাষ্ট্রের প্রধান মীরজা হিমায়েত বেগ ও তার অন্যান্য সহযোগীর (এরপর ৪ পাতায়)

বিজেপির সংযত আচরণেই নীতিশের এই সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ।। ভারতবর্ষের নির্বাচকমণ্ডলী এখন সাবালক। অন্তত বিহারবাসীরা সেরকমই রায় দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবারের বিধানসভা নির্বাচনে। সাম্প্রদায়িকতার জু জু কিংবা নব্বই দশকের লালু-রামবিলাসের সুবিধাবাদী জাত-পাতের রাজনীতিকে এবার ২০১০ সালের বিধানসভার নির্বাচনে বিলকুল ধরাশায়ী করে দিয়েছেন বিহারের মানুষ। নিষ্কর্মা, দুর্নীতিপরায়ণ লালু-রাবড়ির জমানার সুবিধাবাদীর রাজনীতির যুৎসই জবাব। বিহারের

বিহার বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফল - মোট আসন ২৪৩	
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এন ডি এ)	২০৬ (+ ৬৮)
জনতা দল ইউনাইটেড (জে ডি ইউ)	১১৫ (+ ৩১)
ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)	৯১ (+ ৩৭)
রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আর জে ডি)	২২ (-৩৪)
লোক জনশক্তি পার্টি (এল জে পি)	৩ (-৯)
কংগ্রেস	৪ (-৬)
অন্যান্য	৮ (-১৯)
(বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা হলো ২০০৫-এর তুলনায় প্রাপ্ত আসন বেশী বা কম।)	

নির্বাচনে বামেরা লড়েছিল ১৯৫ কেন্দ্রে, কিন্তু একমাত্র বেগুসরাই আসনটি ছাড়া তাদের ঝুলিতে আর একটি আসনও ঢোকেনি। সি পি আই-এর একমাত্র প্রার্থী জিতে জানান দিচ্ছে বামেদের অস্তিত্ব। বিহার রাজনীতির মানচিত্র থেকে পুরোপুরি সাফাই কারাতের দল সিপিএম। কারাতের এই সাফাইয়ের মূল কারণ কি তাঁর ব্যক্তি দম্ভ? বড় দুঃসময় চলছে কারাতের দলের! বিহার প্রমাণ করে দিল ধর্ম, জাত-পাতের রাজনীতি কেবল রাজনৈতিক (এরপর ৪ পাতায়)

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদসহ একগুচ্ছ দাবিতে বিজেপির মহাকরণ অভিযান

ছবি : শিবু ঘোষ

‘পরিবর্তন’ : অশনি-সংকেত

কৃষ্ণচন্দ্র দে।। পরিবর্তন শব্দটা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। পরপর কয়েকটি নির্বাচন থেকে উপনির্বাচন পর্যন্ত সর্বত্র একই রব শোনা যাচ্ছে— এই হলো পরিবর্তনের হাওয়া। অন্ধ কথা শুরু হয়ে গেছে সর্বস্তরেই। আলিমুদ্দিনও দিশেহারা, তারা শুদ্ধিকরণের মন্ত্রজপে এখন ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নে বিভোর।

নানারকম ফন্দি-ফিকির, চাপান-উতোর চলছে, সেই সঙ্গে চলছে সহযোগিতা বনাম অসহযোগিতার তরজার লড়াই। এর মধ্যে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষ, বহিরঙ্গ লাল করে যাদের নুন খেয়ে করে-কম্মে খাচ্ছিল, তারা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন এদের কাছে তাদের আর পাওয়ার কিছু নেই। তারা সুযোগ খুঁজছিলেন অন্য তীরে তরী ঠেকানোর। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম সে সুযোগ করে দিল। ফলতঃ বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী প্রায় ৩২ বছর নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে দিন কাটিয়ে দিদির পালে হাওয়া যোগালেন। অনেকেই সরকারী টাকার মোচ্ছবে বেশ কিছু কামিয়ে নিলেন এবং ভবিষ্যতে আরও কামাবার ক্ষেত্র প্রস্তুতে তৎপর হলেন।

এখন প্রশ্ন হলো, এই অসাংবিধানিক দেনা-পাওনা যেদিন বন্ধ হবে, ওই সমস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কতদিন দিদির চারপাশে ভীড় জমাবেন? এটা একটা বিরাট জিজ্ঞাসার বিষয়। অর্থাৎ দুধ দেওয়া গরুর লাথি তখন কি আর ভাল লাগবে? এর মধ্যেই দু’একজন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তার মুখ দেখাদেখিও প্রায় বন্ধ। ওই সমস্ত সুযোগ-সন্ধানী, স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের কতদিন আর হজম করবেন কালীঘাটের অগ্নিকন্যা? তার অবস্থা এখন সাপের ছুঁচো গেলার মতো। যতদিন যাবে সেটা আরও বাড়বে। তিনি এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন এরা বিনা স্বার্থে তার সঙ্গে মিতালী করতে আসেনি। মাঝখান থেকে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের দরিদ্র আমজনতা চরম দুর্ভোগ ও বিভ্রান্তির মধ্যে দিন গুজরান করছে।

এখন এই পরিবর্তন শব্দটা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ এমন কী কূটরাজনীতিবিদদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তারা ভাবছেন এই পরিবর্তনের সংজ্ঞাটা কি? কার পরিবর্তন? কিসের পরিবর্তন? যদি ক্ষমতার পরিবর্তনই লক্ষ্য হয় তবে-‘পাওয়ার ক্রিয়েটস্ কোরাপশন’ —এই আপ্ত বাক্যটি অন্য দলের পক্ষেও তো সত্য। গণতন্ত্রে ক্ষমতার হাত বদল তো ঘটতেই পারে এবং তা কোনও না কোনও দলের পক্ষে যাবেই, এটাই তো সংসদীয় গণতন্ত্রের রোজনামচা। তবে তো দেখছি সেই সর্বের মধ্যেই ভূত। ২০১১-র নির্বাচন যদি দিদির পক্ষে যায় তবে সেটা কতটা দিদির পক্ষে শুভকর হবে?

(১) বিরোধিতার যে নমুনা তিনি এযাবৎ দেখিয়েছেন, তাতে তিনি নিজেই নিজের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন না হয়ে ওঠেন।

(২) যে প্রতিশ্রুতির বন্যা— কলকাতাকে ইংল্যান্ড বা উত্তরবঙ্গকে সুইজারল্যান্ড ইতালি বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন এবং ক্রমাগত আরও দিয়ে যাবেন, পরিকল্পনা বহির্ভূতভাবে তার এক চতুর্থাংশও পূরণ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।

(৩) কোনও সিদ্ধান্তে তিনিও বিরোধীদের পাত্তা দেবেন না। ফলে আমরা-তোমরা এই বিভাজনের ঊর্ধ্বে তিনিও উঠতে পারবেন না।

(৪) এই ব্যাপারে তিনি তার সহযোগী দলকেও কোনও রেয়াৎ করবেন না। যেমন খেজুরীতে তিনি বা তার দল কংগ্রেসকেও কোনও সভা করতে দিতে চান না। খেজুরী কিংবা নন্দীগ্রাম যেন তার দলের খাসতালুক।

(৫) সর্বগ্রাসী মনোভাব যেমন সি পি এম-এর কাল ঘনিয়ে এনেছে, তার থেকে কোনও শিক্ষাই তিনি নিতে পারবেন না।

(৬) সহযোগী দলের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারেই শূন্য। অতীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী তাকে যে সম্মান দিয়েছিলেন প্রতিদানে তিনি প্রতিনিয়তই তার অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

(৭) যে সমর্থনের দোলায় তিনি দুলছেন তা বামপন্থীদের প্রতি অনাস্থার সমর্থন, পজিটিভ সমর্থন নয়— এ দেয়াল লিখন বুঝতে না পারা।

(৮) আবেগ সর্বস্ব রাজনীতি করতে গিয়ে উন্নয়নকেও বাজী রাখবেন।

(৯) চিন্তাবিদ, সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের সংখ্যা দলে নেই বললেই চলে।

(১০) প্রতিভাবান কোনও ব্যক্তিত্বের প্রতি গোপন ঈর্ষার কারণে দলে তারা চিরদিনই ব্রাত্য। তাদের প্রতি লোক দেখানো ভক্তির গিমিক ধরা পড়ে গেছে অনেকদিন আগেই। সংখ্যালঘু ভোটের জন্য মুহূর্তের মধ্যে দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো ভোল পাল্টিয়ে বোরখাও পরতে পারেন, আবার অভিনয় শেষে মমতা ব্যানার্জী হয়ে বাড়ী ফিরে যান— এ দৃশ্য মানুষ দেখেছে, ব্যঙ্গও করেছে। বহুরূপীদের বেশিদিন টিকে থাকা দুষ্কর।

(১১) কোনও গঠনমূলক সমালোচনাও সহ্য করতে না পারা। সব সময় একটা রণং দেহী মূর্তিতে নিজেকে চার্জ করে রাখা।

(১২) সিপিএম-এর মতোই তোষণ এবং নিজ অনুগতদের পাইয়ে দেবার রাজনীতি করা।

(১৩) নিজ দলের কোনও নেতা, ব্যক্তি বা মন্ত্রী কোনও কাজে সুনাম অর্জন করলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখা এবং ছেঁটে ফেলা। অতীতে এন ডি এ আমলে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল। তার মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত আটকিয়ে দিয়েছিলেন। কবির সুমন থেকে শুরু করে মালা রায়, নির্বেদ রায়, অরুনাভ ঘোষদের অবস্থা সকলেরই জানা। আর সুব্রতবাবুর কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।

(১৪) ক্ষমতায় এলে উনি আর রেল দপ্তরে কিছুতেই থাকবেন না। কারণ মহাকরণের লাল বাড়ীর গদীতে বসার তার বহুদিনের সাধ। তা তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না। ফলে দিল্লীতে যে শূন্যস্থান তৈরি হবে তার হাফডজন মন্ত্রীও তা পূরণ করতে পারবেন না। কারণ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সোনিয়া গান্ধী এমনকী প্রণব মুখার্জীও তার কোনও মন্ত্রীকে তৃণজ্ঞানও করেন না। আবার দলের অন্য কারও হাতে বিশ্বাস করে সে দায়িত্ব তিনি কিছুতেই তুলে দিতে পারবেন না। এ ব্যাপারে তিনি কোনও কাছের নেতাকেও বিশ্বাস করেন না। যদি কেউ এ প্রস্তাব তুলে বলেন— দিদি, আপনি দিল্লীতে রেলমন্ত্রী হয়েই থাকুন, পশ্চিমবঙ্গের ভার আপনার বিশ্বস্ত বা কোনও বিশ্বজনের হাতে দিয়ে যান। ব্যাস্ আর কোনও কথা নেই, ওই ব্যক্তি অচিরেই বহিষ্কৃত হবেন, কোনও সন্দেহ নেই।

একটা কথা প্রায় প্রবাদের মতো তৃণমূল থেকে শুরু করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আড়ালে আবডালে রসিকতাও চলছে। আর তা হলো— ‘‘বাজার কর ঘুরে ঘুরে, মমতা কর দূরে দূরে’’। গণদেবতার উদ্দেশ্যে শুধু একটা কথাই বলতে চাই, আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গে মমতা যত তাড়াতাড়ি ক্ষমতায় আসবে ততই বিজেপি-র পথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে। এদিকটা যেন আমজনতা খেয়াল রাখেন।

আজকের মাওবাদী সমস্যা যেমন সরকার তথা সি পি এম-এর গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ক্ষমতায় এলে সেটা দিদির গলার কাঁটা হয়েই দাঁড়াবে।

পরিশেষে আর একটা ভয়াবহ আশংকার কথা না বলে পারছি না। এইসব দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, অসংবেদনশীল, কু-নজিরস্রষ্টা এঁরা কারা যারা ক্ষমতায় আসছেন? ভাবলেই গণতান্ত্রিক মানুষের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়বেই। আর রাগ হবে সেইসব রেজিমেন্টেড পার্টির নেতা নেতৃত্বের উপর, যাদের অপকর্মে পশ্চিমবঙ্গ আজ এই বিকল্প বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলার মানুষ এঁদেরও ক্ষমা করবে না।

আমজনতার কাছে বাংলার রাজনীতির এই চালচিত্রটি ক্রমশই উন্মোচিত হতে থাকবে ধীরে ধীরে।

(লেখক আইনজীবী)

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুত্ব ও উন্নয়নই বিহারের দিশা

বিহারের নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হইবার সাথে সাথে শুরু হইয়াছে বিজেপি এবং জে ডি (ইউ)-কে লইয়া নানান মন্তব্য। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় দালাল পুঁজিপতি গোষ্ঠী-চালিত সংবাদমাধ্যমগুলি বিজেপি-র উত্থানে শঙ্কিত। সেই কারণে এই সংবাদমাধ্যমগুলি নীতিশ কুমারের উন্নয়নের জয়গান শুরু করিয়াছে। যেন হিন্দুত্বের অনুসারী বিজেপি এই জয়লাভের ক্ষেত্রে কোনও 'ফ্যাক্টর' নয়। যেন তাহারা বিহারের উন্নয়নের জন্যই এতদিন উদগ্রীব ছিল। অথচ এই দালাল পুঁজিপতিদের প্রতিভূ কংগ্রেস দল স্বাধীনতার পর হইতে দীর্ঘদিন বিহারের ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও বিহারের কোনও উন্নয়নই করে নাই।

এই দালাল গোষ্ঠী উন্নয়নের চাহিতে হিন্দুত্বকেই বেশী ভয় পায়, এটা নিশ্চি ত। এই কারণেই নীতিশের উন্নয়নকে লইয়াই তাহারা বেশী সোচ্চার। তাহারা ভাল করিয়াই জানে সমাজ-সংস্কৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন মানুষকে বেশিদিন সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবে না। উন্নয়নেরও একটি দর্শন থাকা চাই। সেই দর্শনটি হইতেছে ভারতীয় দর্শন। উন্নয়নের এই দর্শনের কথা স্বামীজী যেমন বলিয়াছেন, তেমনি বলিয়াছেন স্বয়ং গান্ধীজী যিনি কংগ্রেসেরই একজন পথ প্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথ তো স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছিলেন যে হিন্দুত্ব পরিপূর্ণ ভারতীয়ত্বের সমার্থক, আর এর থেকে আলাদা হইবার অর্থ হইল ভারতবর্ষ থেকেও তার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা।

এই উন্নয়ন যদি হিন্দুত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তবে তা অবশ্যই ভারতীয়ত্ব হারাইবে। ভারতীয়ত্ব হারাইলে ভারতীয় শিল্প হইবে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের বিকাশ মাত্র, ভারতীয় জাতীয় শিল্পের বিকাশ অধরাই থাকিয়া যাইবে। স্বামীজীর কথায়, ভারতীয় ন্যায়-নীতি, সংস্কৃতি-সভ্যতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আধার বেদান্ত-দর্শন। এই বেদান্তের মূলাধার হইল চিন্তার স্বাধীনতা। পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋকবেদের মধ্যেই আছে এই অদ্বৈতবাদের প্রথম ধারণা—"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" অর্থাৎ যা সত্য তা এক এবং অদ্বিতীয়, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাকে নানা নামে অভিহিত করেন। তাই বেদান্তের ভাষায় চিন্তার স্বাধীনতাই ঈশ্বর, ভালবাসাই ঈশ্বর।

উন্নয়নের সহিত হিন্দুত্বের বিরোধ তো নাই-ই, বরং হিন্দুত্বের মূল ভাবনাকে বৈদান্তিক সমাজতান্ত্রিক পথ হিসাবে স্বামীজী ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের একমাত্র অপরিহার্য পথ বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। কারণ এই পথই সবচেয়ে উদার ও স্বাভাবিক, এই পথই একমাত্র ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও সমাজতন্ত্রের গুণগুলির সঠিক সমন্বয় সাধন করিতে পারে। এই ধরনের বিকাশ মানুষকে প্রাকৃতিক ন্যায়ের কাছাকাছি লইয়া আসিতে সক্ষম। পুঁজিবাদও নারী-পুরুষের স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু তা একান্তই রাজনৈতিক এবং তা ভোটাধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বৈদান্তিক সমাজতন্ত্র যে স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকে তা মানুষকে আত্ম-সংযমী করিয়া তোলে যার দ্বারা সে নিজেকে অশুভ মনের তাড়না থেকে মুক্ত বা বিরত রাখিতে সক্ষম হয়। স্বামীজী তাই সর্বদা সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের কর্মসূচীর পিছনে বেদান্তের ভূমিকাকেই প্রধান কারিগর (ইঞ্জিনিয়ার) হিসাবে গুরুত্ব দেওয়ার উপরেই জোর দিয়াছেন। ইউরোপীয় ভোগবাদী দর্শনের নিরীখে নয়, যে দর্শনের মূল কথাই হইল ত্তনন্ধড়দ্ধ নব্দ ত্মনন্ধড়দ্ধ অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার এবং ক্সত্রত্তুজ্ঝল্পপ্ত ঈন্দ্র ন্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রনন্ধন্ধন্দ্বব্দন্ধক্স—কেবল যারা সবল তাদেরই বাঁচার অধিকার। বেদান্ত ঠিক তাহার বিপরীত। একজন প্রকৃত বেদান্তবাদী তার সহকর্মীর জন্য কোনওরকম বিবেক তাড়না ছাড়াই প্রাণত্যাগ করিতে পারে, কারণ সে জানে তার আত্মা মৃত্যুহীন। সুতরাং সে অপরের ভালো করিয়াই চলে।

প্রখ্যাত দার্শনিক দত্তপন্ত ঠেংড়িজীও বলিয়াছেন, হিন্দুত্ব ও মানবতা সমার্থক শব্দ। সুতরাং যদি মানব উন্নয়ন চাও, তাহা হইলে হিন্দুত্বকে বাদ দিয়া তাহা আসিতে পারে না। বিহারের উন্নয়ন হোক, ইউরোপীয় পুঁজিবাদী পথে নয়, মানবতাবাদী ভারতীয় পথে। জাতীয় পুঁজি বিকশিত হোক, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী পুঁজি নয়। চাই আত্মনির্ভর জাতীয় শিল্প, বিদেশী পুঁজি নির্ভর শিল্প নয়। সঙ্গে সঙ্গে আত্মোন্নতি হোক। জাত-পাত-ধর্মীয় গোঁড়ামী দূর হোক। ধর্মনিরপেক্ষ নামক রাজনৈতিক বাক্যটি নিষিদ্ধ হোক। চালু হোক সর্বধর্ম সমভাব সর্বপথের সমাদর, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে পুঁজি করিয়া রাষ্ট্র বিরোধিতার প্রয়াস দৃঢ় হাতে মোকাবিলা করা হউক।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

বলবানের দিকে সকলে যায়, গৌরবান্বিতের গৌরবোচ্ছটা নিজের পাত্রে কোনও প্রকারে একটুও লাগে, দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি তখন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

'বণিক ওবামা'র ভারত আগমন
কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য

তারক সাহা

গত চারদশকে বিস্তর পাল্টেছে বিশ্ব রাজনীতি। লোপাট হয়েছে কম্যুনিস্ট দুনিয়া, শেষ হয়ে গিয়েছে জওহরলাল—প্রেসিডেন্ট টিটোর কল্পনাপ্রসূত জোট নিরপক্ষ রাজনীতি। সাতের দশকের শুরুতে বাংলাদেশ গঠনের পর ভারতকে সহ্য করতে হয়েছে প্রেসিডেন্ট রেগনের চোখ রাঙানি। বিশ্ব এখন এক মেরু। আমেরিকা এখন দাদা। কিন্তু দাদা হয়েও দাদাগিরি ফলাতে পারছে না দুনিয়ার দেশগুলির ওপর। ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দা মার্কিন-মুলুকে রিপাবলিকানদের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে বারাক হুসেন ওবামা-র কর্তৃত্বের মাত্র দু' বছরের মধ্যে। ২০১২-র নির্বাচনে বারাক ওবামার দল ক্ষমতায় ফিরতে পারবে কিনা তা এখন বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এমন-ই এক সন্ধিক্ষণে ওবামার ভারত সফর। কতগুলি বিষয়ে ভারত তাকিয়েছিল ওবামার সফরের দিকে। সেগুলি হলো—(১) নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যকরণ, (২) সন্ত্রাসবাদী প্রশ্নে পাকিস্তানের সমালোচনা এবং সামরিক সহায়তা বন্ধ, (৩) কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের পাশে দাঁড়ানোর মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যু। এইসব ইস্যু বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে।

একবিংশ শতাব্দীতে দুনিয়া দেখছে সন্ত্রাসবাদের বাড়-বাড়ন্ত। ৯/১১, ২৬/ ১১-র মতো ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে মার্কিনমুলুকে, আর মুম্বাই-তে। সন্ত্রাসবাদীদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তান জেনেও পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য বন্ধ করেনি বুশ বা ওবামা প্রশাসন। বরং বিন লাদেনের সন্ধানে ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে জর্জ বুশ আফগানিস্তানে। মিথ্যা অজুহাতে ইরাকে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে মার্কিন নামক 'দাদা'।

দেশ	অস্ত্র সামগ্রী	মূল্য (ডলারে)
ভারত	১। এম-৭৭৭ আলট্রালাইট উৎক্ষেপন যন্ত্র, ১৪৫টি টেন রেজিমেন্টস গান।	৬৪৭ মিলিয়ন
	২। ৯৯টি এফ-৪৩৪ ইঞ্জিন	৬৫০ মিলিয়ন
	৩। ১২টি পি-৮১ পোজিডন লংরেঞ্জ মেরিটাইম প্যাট্রল বিমান	৩ মিলিয়ন
	৪। ৬টি সি-১৩০ জে হারকিউলিশ স্পেশাল ট্রান্সপোর্ট বিমান	১ বিলিয়ন
	৫। ১০টি সি-১৭ গ্লোবমাস্টার-তিন বিমান-বাহিনির জন্য হেভিলিবাট বিমান	৩ বিলিয়ন
পাকিস্তান	১। এম-২০৯ স্বয়ক্রিয় কামান। ১১৫টি কামান	৮৭ মিলিয়ন
	২। ১৮টি এফ-১৬ বিমান, পুরাতন এফ-১৬টি। উন্নতমানের প্যাক এফ-১৬টি বিমান।	১.৪ বিলিয়ন ৪৯১ মিলিয়ন
	৩। ৮টি সি-১৩০ই পরিবহন বিমান	৪৭৪ মিলিয়ন
	৪। মিসাইল ঃ ১০০টি হারপুন জাহাজ বিধবংসী ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৫২৫০ টি টি ও ডব্লু ট্যাংক বিধবংসী ক্ষেপণাস্ত্র।	২৯৮ মিলিয়ন ১৮৬ মিলিয়ন
	(সূত্র ঃ ইন্ডিয়া টু-ডে)	

সুতরাং বদলে গেছে পুরো দুনিয়ায় রাজনৈতিক চালচিত্র। মার্কিন মুলুকে সবচেয়ে অস্বস্তিকর অবস্থা হলো সে দেশের বেকারত্ব। উন্নয়নশীল দেশগুলির বেকারীর ভাইরাস মার্কিনমুলুকেও প্রবেশ করেছে। দশ শতাংশ বেকারত্ব নিয়ে ওবামার ফরমান 'নো আউটসোর্সিং'। মাথায় হাত ভারতের। তথ্য প্রযুক্তি শিল্প যা এদেশে বেশ রমরমিয়ে চলছে তাতে কি তাহলে রাশ টানবে ওবামা প্রশাসন?

এমনসব জল্পনা নিয়ে তিন দিনের সফর শেষ করলেন ওবামা। নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে তার সদস্যতা স্থায়ী করতে দীর্ঘ ৬৬ বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও ওবামা ভরসা দিয়েছেন যে, তাঁর দেশ সমর্থন করবে এই বিষয়ে। ওবামা নিজেই এদেশের আর্থিক বুনিয়াদের প্রশংসা করেছেন। ২০০৮-০৯ সালে আর্থিক মন্দায় সুনামির মতো দুনিয়ার তাবড় তাবড় অর্থব্যবস্থার ভিত নড়ে গেলেও টলেনি এদেশের অর্থনীতি। তারই স্বীকৃতি ওবামার বয়ানে। ১২০ কোটির এদেশ যে বাণিজ্যের গন্তব্য এমনটা ভাবা ওবামার পক্ষে অমূলক নয়। তাই তো ২০০৪ থেকে ২০০৯ এই দীর্ঘ ছয় বছরে ভারতীয় ৯০টি কোম্পানী মার্কিন মুলুকে ১২৭টি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে যার আর্থিকমূল্য ৫.৫ বিলিয়ন ডলার এবং সেদেশে প্রায় ১৭ হাজারের হাতে কাজ দিয়েছে। সেইজন্যই আমেরিকার 'ফার্স্ট সিটিজেন' ভারতকে 'উন্নত দেশ' বলতে দ্বিধা করেননি। স্বাধীনতার পর এদেশে বাণিজ্য যে থমকে যেত লাইসেন্স রাজের গেরোয়, একবিংশ শতকে সেই সংরক্ষণবাদকে একেবারেই বর্জন করেছে ভারত।

বাণিজ্য-মন্ত্রকের সূত্র অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০-০১ সালে আমদানি ছিল ২০ মিলিয়ন ডলার আর এদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছিল ৩০ মিলিয়ন ডলার। ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে আমদানি বেড়ে হয় ১৬.৯৭৩ মিলিয়ন ডলার, রপ্তানিও কিছুটা বেড়ে হয় ১৯.৫৩৫ মিলিয়ন ডলার।

দেশটা যখন আমেরিকা এবং সেদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কোনও দেশ সফরে যান তখন তার গুরুত্ব অপরিসীম। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও চিরশত্রু এক দেশ। চারটে যুদ্ধ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, কাশ্মীর নিয়ে সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আপ্রাণ প্রয়াস চালালেও আমেরিকার তাতে সায় দেয়নি। যদিও আমেরিকার সবচেয়ে বড় অস্ত্র খরিদ্দার হলো পাকিস্তান। ওবামার সামনে দুটো বড় সমস্যা তাঁর পূর্বসূরী বুশ রেখে গিয়েছেন—আফগানিস্তান আর পাকিস্তান। দুটো দেশই সন্ত্রাসবাদীদের জন্মদাতা। তা জানা সত্ত্বেও ওবামার পাকিস্তানের অস্ত্রভাণ্ডারে অতিরিক্ত ২ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে। এই অর্থ দিয়েই পাকিস্তান আরও এফ-১৬ ফাইটার বিমান-কিনবে, যুদ্ধ জাহাজ কিনবে, তা আগামীদিনে হয়ত ভারতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করবে।

এশিয়ায় চীনের বাড়-বাড়ন্ত আমেরিকার কাছে একটা সমস্যা বটে। জি-২০ দেশগুলির সম্মেলনে চীন তাদের দেশের রপ্তানি বাড়াতে কৃত্রিমভাবে নিজেদের মুদ্রার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে ডলারের তুলনায়। এটা ওবামার চিন্তার বিষয়। চীনে তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য যেভাবে দুনিয়ায় বাজারে জেঁকে বসেছে তাতে আমেরিকা উদ্বিগ্ন। ভারতের সঙ্গে তাই তার সৌহার্দ্য। ভারত যে তাঁর স্বাভাবিক বন্ধু তা বোঝাতে কাশ্মীর শব্দটা উচ্চারণ করেননি ওবামা। ঠাণ্ডা যুদ্ধের দিনগুলিতে রাশিয়া যেভাবে অস্ত্র জুগিয়েছে ভারতকে, আজ রাশিয়ার পতনের পর ওই শূন্য স্থানটি পূরণে এগিয়ে এসেছে ওবামার দেশ। এ বছরে চুক্তি হয়েছে ৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যে ১১১টি পণ্যবাহী বিমান কিনবে ভারত। পাকিস্তান ধারে যুদ্ধ সামগ্রী পেলেও ভারত তা নগদে মিটিয়ে দিয়েছে এবং এত বিপুল অর্থ ওবামা প্রশাসনের আর্থিক দৈন্যতা কাটাতে অক্সিজেন যুগিয়েছে। ২০০৮ থেকে ভারত সে দেশ থেকে ধাপে ধাপে ৮.২ বিলিয়ন ডলার অস্ত্র কিনতে চুক্তিবদ্ধ। ২০০৮ সালে ভারত ও পাকিস্তান যুগপৎ দুই রাষ্ট্রের অস্ত্র কেনার শপিং লিষ্ট বর্ণিত হয়েছে সারণীতে।

বারাক ওবামার এবারের ভারতসফর তাঁর পূর্বসুরী রাষ্ট্র প্রধানদের থেকে আলাদা। নেহরুর আমলে জন কেনেডির ভারত সফর কিংবা পরবর্তীকালে রিচার্ড নিক্সন বা জিমি কার্টারের ভারতসফরের সময়ে ভারত ছিল মার্কিন কৃপাপ্রার্থী। পি এল ৪৮০-তে গম না এলে এদেশের মানুষ অনাহারে দিন কাটাবে এমন পরিস্থিতি থেকে উঠে এসেছে ভারত গত তিন দশকে। সবুজ বিপ্লব হয়েছে, নেহরুর যৌথ অর্থনীতির দিন শেষ। ভারত এখন উন্মুক্ত বাজার। আমদানি-রপ্তানি লাল ফাঁশ পুরোপুরি না কাটলেও অনেকটাই কেটেছে গত একদশকে। ভারতে একসময়ে বিদেশী মুদ্রায় সঞ্চ য় তলানিতে ঠেকেছিল। আজ সম্পদে ভরপুর। বৃহৎ বাজার, যোগ্য কাজের লোকের অভাব কোনওটাই আজ নেই ভারতে। তাই বাজার খুঁজতে বেরিয়ে 'বণিক ওবামা' উচ্ছ্বসিত ভারতে অর্থনীতির জয়যাত্রায়। তাই তারই কণ্ঠে শোনা গেল ভারতের স্তবগান— কারণ তো একটাই, উল্টে পাল্টে গেছে দিন।

বিজেপির সংযত আচরণেই নীতিশের এই সাফল্য

(১ পাতার পর)

দলগুলির বেসাতি। মানুষ চায় উন্নয়ন। ‘বিজলি-পানি-সড়ক’ বাজপেয়ীর আহ্বান যেমন গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশে নরেন্দ্র মোদি, শিবরাজ চৌহান প্রমুখ নেতাদের সাফল্য এনে দিয়েছে, ঠিক একই ফর্মূলায় বিহারে সাফল্য পেয়েছে এন ডি এ।

প্রশ্ন হলো যে প্রাক্ বিহার নির্বাচনে নীতিশ কুমারের নরেন্দ্র মোদির ছুতমার্গ এন ডি এ জোটকে খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছিল; কিন্তু এবারে বিধানসভা নির্বাচনের পর নীতিশ কুমার কি সেই ছুতমার্গ জিইয়ে রাখবেন? মনে রাখতে হবে এন ডি এ-কে অটুট রাখতে বিজেপি নেতৃত্বের সংযত আচরণই আজ নীতিশকে এই সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা আজও উন্নয়নের রোল-মডেল কিন্তু সেই নরেন্দ্র মোদি। নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সোনিয়ার কুখ্যাত অপবাদ ‘মওত-কী-সওদাগর’ মোদির সাফল্যকে টলাতে পারেনি। বরং সেই অপপ্রচারকে সশব্দে ধরাশায়ী করেছে গুজরাটের আম-জনতা। বিধানসভা থেকে পঞ্চায়েত সর্বত্র মোদির জয়জয়কার। মোদির এই সাফল্যে কেবল হিন্দুরাই নয়, ১০ শতাংশ মুসলীম জনতাও সামিল। নইলে রাজ্যের এত বড় সাফল্য সম্ভব নয়।

বিহারের এই নির্বাচনের পর বেকায়দায় কংগ্রেস। বিহারের নির্বাচনের আগে তরুণ নেতা হিসেবে রাহুলকে সামনে এনে ২০১৪ সালে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরার যে কংগ্রেসী প্রয়াস তাতে ব্রেক লাগল। মনে হয় মনমোহন সিং-এর কপাল ভাল। বিভিন্ন রাজ্যে আগামীদিনে যে সব নির্বাচন আসছে তাতে সেই ধারা বজায় থাকতে পারে। আর এর অন্যথা হলে, অর্থাৎ ২০১৪-তে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসলে সোনিয়া কংগ্রেস আরও একবার মনমোহনকে গদিতে থাকবার সুযোগ দেবে। বিহারের নির্বাচনী ফল মমতাকেও স্বস্তি দিয়েছে। মমতার ‘বসন্তের কোকিল’ এরাজ্যে ভ্রমণকালে কংগ্রেসের মান-মর্যাদার কথা বলে গেলেন, তাতে বোধহয় অখুশী তৃণমূল নেত্রী। কমজোরি করে দেবেন মানস ভুঁইয়াদের লম্ফ-ঝম্ফ। দাবার চালটা এবারে মমতাই দেবেন। মমতার শর্তেই এরাজ্যের তৃণমূল-কংগ্রেস জোট হবার সম্ভাবনা।

এবারের নির্বাচনে বিহার বিজেপি-র মর্যাদা অনেকটাই বেড়ে গেল। বৈদ্যুতিন মিডিয়াগুলি বিহারের কাণ্ডারী হিসেবে যেভাবে নীতিশ কুমারকে তুলে ধরেছে তাতে একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে। কারণ এবারের নির্বাচনে নীতিশের সাম্প্রদায়িক ছুত-মার্গের কারণে বিজেপি-কে প্রায় একাই লড়তে হয়েছে বিহারে। বিহারের নির্বাচনী ফলাফলে যা দেখা যাচ্ছে তা হলো নিতীশ কুমারের থেকে ৬টি আসন বেশী পেয়েছে সুশীল মোদীরদল। নীতিশ কুমার যদি জোট ভেঙ্গে একা লড়তেন এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে, নীতিশকুমারের দল ১১৫টি আসনই পেত তবে ১৪৩টি আসনের বিধানসভায় সরকার গড়তে নীতিশকে অন্যদলের সাহায্য নিতে হোত। বিজেপি-র সঙ্গে জোট না থাকলে কি স্বস্তিতে আরও পাঁচটা বছর বিহার চালাতে পারতেন নীতিশ? নীতিশ হয়ত লক্ষ্য করেছেন কংগ্রেসী ‘পোল ম্যানেজারদের’ হাতে কেবল পেন্সিল। একলা চলো নীতি নিয়ে চলতে গিয়ে সবকটা আসনে প্রার্থী দিয়েও সোনিয়ার দল পেয়েছে মাত্র ৪টি।

সম্ভবত কংগ্রেসের কাছে এটাই বড় শিক্ষা যে আগামী ৫ বছরে বিহারের কাণ্ডারী নীতিশ কুমার। কারণ বিহারে কংগ্রেসী এই ফলের পিছনে কেন্দ্রের রাজনীতি রয়েছে। দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার সবক্ষেত্রেই ব্যর্থ। সীমাহীন দুর্নীতিতে বিদ্ধ কংগ্রেস সরকার। মূল্যবৃদ্ধি তে জেরবার সাধারণ মানুষ। দু’-বেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থানে সাধারণ গরীব গুর্বোদের প্রাণান্তকর অবস্থা। সুতরাং আগামীদিনে কংগ্রেসের কাছে বিহারের রাজনীতি এক অশনি সংকেত।

মানুষ বলছে তারা ভুল করেছে ২০০৪ সালে এন ডি এ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। বিহারের, গুজরাটের নির্বাচন অন্ততঃ তারই সাক্ষ্য। বাজপেয়ীর গ্রাম সড়ক যোজনা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া, বিজলি-পানি-সড়কের স্লোগান তো এন ডি এ সরকারেই। জিনিষপত্রের মূল্য ছিল নিয়ন্ত্রণে। রাজনৈতিক নেতারা আর এদেশের নির্বাচকমণ্ডলীদের নির্বোধ ভাবতে পারবে না এমনটাই বিহার দেখিয়ে দিল। এন ডি এ জোটের এমন সাফল্যের চাবিকাঠি কোথায়?

অনেকেই হয়ত মানবে না যে, বিহারের আম-ভোটাররা বিহারের উন্নয়নের পেছনে গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর সাফল্যকে পরোক্ষে ইন্ধন জুগিয়েছে। সম্প্রতি সরকারী রিপোর্টেই রয়েছে যে, দেশে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দলগুলি যে সব সরকার চালাচ্ছে তার মধ্যে উন্নয়নের প্রশ্নে, আর্থিক সাফল্যে বিজেপি তথা এন ডি এ সরকারগুলিই অগ্রণী ভূমিকায়। সাধারণ মানুষ কিন্তু এগুলি নিঃশব্দে লক্ষ্য করে। মানুষের সমস্যা কিন্তু ধর্ম, জাত-পাত নয়। মানুষের সমস্যা ভাল রাস্তা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, গুন্ডারাজের অবসান (লালু জমানায় বিহার মাফিয়ারাজের আখড়া হিসেবে পরিচিত হলেও নীতিশের গত ৫ বছরের রাজত্বকালে তা অনেকটাই অবদমিত), সবার হাতে কাজ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। যে সরকার আম-জনতার এইসব সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট বা সক্ষম তারাই মসনদ চালাবে। ‘অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর’ তাই গুজরাটে, বিহারে কাজে লাগেনি।

নীতিশের তাই লক্ষ্য হবে আগামী ৫ বছরে এন ডি এ জোট অক্ষুণ্ণ রেখে দুর্নীতিমুক্ত, উন্নয়নমুখী বিহার গড়া। পূজা-পাঠ, জাতপাত নয়, লড়াই শুধু গরীবির বিরুদ্ধে গুণ্ডারাজের বিরুদ্ধে। আশা — নীতিশ এই নির্বাচনের ফলফলে পুরাতন ত্রূটিবিচ্যুতিগুলি পুনরাবৃত্তি করবেন না, যেখানে বিজেপি আর সাম্প্রদায়িক দল নয়। কাটিয়ে উঠবেন নরেন্দ্র মোদীর, বিজেপির ছুতমার্গ। লক্ষ্য থাকবে সামনে, পিছনে নয়।

সি বি আইয়ের নতুন ডিরেক্টর

সি বি আই-এর নতুন ডিরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত হলেন অমর প্রতাপ সিং। ১৯৭৪-এর ঝাড়খণ্ড ক্যাডারের আই পি এস শ্রীসিং-এর বয়স এখন ৫৮। ইতিপূর্বে বি এস এফ-এর ডিরেক্টর জেনারেলের পদ অলঙ্কৃত করা ছাড়াও একাধিক পুলিশী খেতাব জিতেছেন তিনি। তবে পূর্বসূরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সোনিয়া-অনুগামী হওয়াই তাঁর ভবিতব্য কি না তা সময়ই বলবে।

লস্করের টার্গেট হিন্দু তীর্থস্থান

(১ পাতার পর)

বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল। জার্মান বেকারী ছাড়াও ন্যাশানাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমী এবং শ্রীমন্ত দাগদুশেঠ হালওয়াই গণপতি মন্দিরে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করে তারা।” এই মন্দিরটিকে লস্করের ‘টার্গেট’ করা প্রসঙ্গে সেই আধিকারিকের বক্তব্য—“গণপতি মন্দিরটিকে লস্করের পছন্দ করার কারণ যেহেতু সেটি একটি ধর্মক্ষেত্রে আর প্রতিদিন বিশেষ করে গণেশ চতুর্থীর দিন এখানে এত পুণ্যার্থীর সমাগম হয় যে, এখানে বিস্ফোরণ ঘটালে বহু মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক নজরও তাদের দিকে ফেরানো যাবে। লস্করের গুপ্তচররা বহুদিন ধরেই মন্দিরের নিরাপত্তার দিকটা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল। সেইমতোই তারা পরিকল্পনা করেছিল। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী-ই সীমান্তের ওপার থেকে জম্মু-কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে পুণেতে বোমা আমদানী করা হয়েছিল। জার্মান বেকারী বিস্ফোরণের ঘটনা এবং অন্য একটি ঘটনায় ওই দু’জনকে গ্রেপ্তার করতেই লস্করের অন্যান্য জঙ্গিরা গণেশ চতুর্থীর দিন গণপতি মন্দিরে বিস্ফোরণের কর্মসূচী মুলতুবি রাখে।”

প্রসঙ্গত, পুণের বুদ্ধ ওয়ার পীঠ এলাকায় অবস্থিত ওই গণপতি মন্দিরটি ১৮৯৩ সালে জনৈক মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী দাগদুশেঠ হালওয়াই তাঁর গুরুদেবের পরামর্শে পুত্র-সন্তানের শোকে ও স্মৃতিতে নির্মাণ করান। মহারাষ্ট্রে গণেশ উৎসবের সময় মুম্বাইয়ের লালবাউগছা রাজা মন্দিরের মতোই লোক-আকর্ষণ করতো পুণের এই গণপতি মন্দিরটি।

কাকতালীয়ভাবে, মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ গত সেপ্টেম্বরেই একটি সতর্কবার্তা জারি করে বলেছিল দু’জন হরকত-উল-জেহাদ-আল-ইসলামী (হুজি) জঙ্গি মুম্বাইয়ে প্রবেশ করেছে জনবহুল হিন্দু তীর্থস্থানে বিস্ফোরণ ঘটাবে বলে। ওই দু’জন জঙ্গির নাম—কলিমুদ্দিন খান ওরফে রামেশ্বর পণ্ডিত এবং হাফিজ শরিফ। পুলিশ সূত্রের খবরে, এই দুই জঙ্গিকে শেষ দেখা গিয়েছিল লালবাউগ এলাকায়, যেটা লালবাউগছা রাজার খুব কাছেই অবস্থিত।

দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে খারিজ বিহারবাসীর

(১ পাতার পর)

প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে যে কংগ্রেসের আর্থিক দুর্নীতি তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। বিহারে কংগ্রেসের অস্তিত্বই মুছে গেছে। চুরি বা চোরদের আড়াল করতে কংগ্রেস নেতৃত্ব বর্তমানে যে অনড় নীতি নিয়েছে তাতে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে আগামী দিনে সমস্ত গণ নির্বাচনেই কংগ্রেস হারবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব দলের দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের শাস্তি হোক তা চায় না। আর চায় না বলেই ১,৭০,০০০ কোটি টাকার টু জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির তদন্তে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জে পি সি) গঠিত করা হোক বিরোধীদের এই দাবি মানছেনা। কেন? কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে বলে? স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে প্রধান অভিযুক্ত প্রাক্তন ডি এম কে টেলিকম মন্ত্রী এ. রাজা দাবি করেছেন তিনি যা কিছু করেছেন সবই প্রধানমন্ত্রীর অফিসের জ্ঞাতসারে। বেআইনিভাবে ভারতের আকাশ ব্যবহারের অধিকার দেওয়ার বরাতের ফাইলেও এই কথা দক্ষিণের এই ‘রাজাবাবু’ নিজের হাতে লিখেছেন। জলের দরে দেশের আকাশ ব্যবহারের অধিকার বহুজাতিক মোবাইল কোম্পানীগুলিকে বেচে ডি এম কে এবং কংগ্রেসের নেতা নেত্রীরা প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা নিজেদের পকেটে পুরেছেন। স্বাধীনোত্তোর ভারতে এতবড় আকারের দুর্নীতি অতীতে হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা মন্তব্য করেছেন, ‘মাদার অব অল স্ক্যামস্’ বলে। এরপরেও কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে জে পি সি গঠনে রাজি নন। অবশ্যই ডি এম কে দলের চুনোপুঁটি নেতা এ. রাজাকে বাঁচাতে নয়। তবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা কারা? যাদের আড়াল করতে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সামনে রেখে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সর্বস্ব পণ করেছে।

বিরোধীদের জে পি সি-র দাবি মানতে নারাজ মনমোহন সিংহ সরকারের জেদে গত দুই সপ্তাহ সংসদ অচল হয়ে আছে। চলতি শীতকালীন অধিবেশন শেষ হবে ১৩ ডিসেম্বর। এরমধ্যে সংসদ সচল হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। এটিও দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে বিরলতম ঘটনা। সাংসদরা অধিবেশন চলাকালে দৈনিক ভাতা পান দু’হাজার টাকা। দেশের মানুষের দৃষ্টি আর্থিক কেলেঙ্কারি থেকে ঘোরাতে এবং নিজেদের ‘সৎ’ প্রমাণ করতে সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁর পুত্র রাহুল সংসদ অচল থাকাকালে দৈনিক ভাতা দুই হাজার টাকা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত সাংবাদিক বৈঠক ডেকে প্রচার করেছেন। তাঁদের ‘আদর্শ’ অনুসরণ করে কংগ্রেস সাংসদরা সকলেই দৈনিক হাজিরা ভাতা বর্জনের ঘোষণা সাড়ম্বরে করেছেন। ভাল কথা। কংগ্রেসের সাংসদরা দৈনিক ভাতা না নিলে কত টাকা সাশ্রয় হবে? কংগ্রেস নেতৃত্ব বলেছে সাশ্রয়ের পরিমাণ কমপক্ষে দৈনিক চার লক্ষ টাকা। আর টু জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব হারিয়েছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা। কংগ্রেস নেতৃত্ব চাইছে ‘জে পি সি’ নয়, স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির তদন্ত করুক সি বি আই। কারণ, সি বি আই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে একটি সংস্থা। প্রয়োজনে তদন্তের মুখ অন্যদিকে ঘোরানো যেতে পারে। কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দেওয়া যেতে পারে। এমন নজির কংগ্রেস জমানায় অনেক আছে।

স্বজনপোষণ ও আর্থিক কেলেঙ্কারি কীভাবে ধামাচাপা দিতে হয় তা কংগ্রেসের থেকে ভাল অন্য কোনও দল জানে না। কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারির ঘটনা যথেষ্ট টাটকা। কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে গেমসের প্রধান সংগঠক কংগ্রেস সংসদীয় দলের সচিব সুরেশ কালমাডিকে বরখাস্ত করা হয়েছে। যেমন, মুম্বাইয়ের বহুতল আদর্শ সমবায় আবাসনে স্বজনপোষণ ও বেআইনি নির্মাণ মদত দেওয়ার অভিযোগে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যবনকে সোনিয়ার নির্দেশে বরখাস্ত করা হয়। এ সবই আই ওয়াশ। জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কংগ্রেসী ছক। অতীতে এই ছকেই কংগ্রেস অনেক বড় বড় কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি ধামাচাপা দিয়েছে।

যেমন, এখন থেকে দু’ বছর আগে ২৬ নভেম্বর মুম্বাইয়ে পার্ক-জঙ্গি হামলা মোকাবিলায় চরম ব্যর্থতার জন্য তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকে সোনিয়ার নির্দেশে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। একই কারণে বরখাস্ত করা হয় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিলাসরাও দেশমুখকে। মিডিয়া তখন কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিস্তর বাহবা দিয়েছিল।

পরবর্তীকালে এই সোনিয়ার নির্দেশেই শিবরাজ পাতিল রাজ্যপাল হন। বিলাসরাও দেশমুখ এখন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী। অদূর ভবিষ্যতে সুরেশ কালমাডি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবেন। তাই তিনি এখন চুপটি করে আছেন। হাওয়া ঠাণ্ডা হলেই স্বমহিমায় ফিরবেন। গত ২ নভেম্বর দিল্লীর তালকোটরা স্টেডিয়ামে এ আই সি সি-র বৈঠক হয়েছে। সেখানে আদর্শ আবাসন দুর্নীতি নিয়ে সোনিয়া-মনমোহন-প্রণব একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। সুরেশ কালামাডিকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। এর থেকেই স্পষ্ট যে কংগ্রেস নেতৃত্ব দলীয় নেতাদের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়। প্রয়োজনে আড়াল করে। আর তা করে বলেই দুর্নীতির অভিযোগে পদ হারানো মহারাষ্ট্রের চারজন প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যবন, বিলাসরাও দেশমুখ, সুশীল কুমার শিন্ডে এবং নারায়ণ রাণে জেলখানার বদলে কংগ্রেসের ঘর আলো করে বসে আছেন। বিহার এই দুর্নীতিগ্রস্থ দলকে খারিজ করেছে। বাকি দেশ এখন কী করে সেটাই দেখার। ভুললে চলবে না এই বিহারই একদা ইন্দিরার জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিল।

কমিউনিস্টরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, রক্ষণশীল গোষ্ঠীর কূপমণ্ডুক

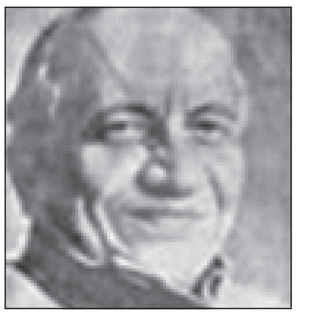
এস এ ডাঙ্গে

পি সি যোশী

বি টি রণদিভে

বিমান বসু

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

গোয়াতে চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করলেন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি টলিউডের কথা তুলে ধরেছেন। সংবাদপত্রে দেখ্‌লাম, "তিনি কর কমানোর কথা বলে গ্রাসরুট থেকে গ্ল্যামার ওয়ালর্ড জয় করলেন।" ঠিক এই ঘটনার পাশাপাশি এই রাজ্যের দশম নাট্যমেলার উদ্বোধন হলো। এই অনুষ্ঠানে নাট্যকার-অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত যে বক্তৃতা করেছেন, তার মোদ্দা কথা হলো— "এই সরকারের এটি শেষ নাট্য মেলা। সামনের বছরে নির্বাচন হবে। নতুন সরকার আসবে। ভোটবাক্স, সেমিনার এবং বিতর্কসভায় আমরা-ওরা বিভাজন নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তা'হলে খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। নির্বাচনের পর যখন সরকার আসে, সেটা কোনও বিশেষ দলের সরকার থাকে না। কোনও বিশেষ দলের লোকের সরকার সেটি হয় না। এটা কোনও সরকারের ভাষা হতে পারে না। যখন আমরা-ওরা কথা আসে, তখনই সাধারণ মানুষ বিপন্ন বোধ করেন এবং বিষণ্ণ হন। এই দেশ গরিবদের। আমাদের রাজ্যটাও বড়লোকদের নয়। তাই মানুষের জন্য সঠিক কাজ করলে বিভাজন কমবে। এ-ব্যাপারটাতে সরকারে থাকা দলেরই উদ্যোগ নিতে হবে।"

এই অবস্থা হলো কেন? পাঠক মাফ করবেন— আমি পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটছি। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নেতা ছিলেন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন প্রতুল লাহিড়ী। এহেন ব্যক্তি কেন বিরুদ্ধে গেলেন। কারণটা কি— সিপিআই(এম) দলের ব্যর্থতা? আসলে শিল্পী সাহিত্যিকদের সম্পর্কে মূল্যায়ণে ভুল হয়েছে। এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ভবানী সেন, রবিগুপ্ত ছদ্মনামে "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের সমালোচনা" নামক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' থেকে উদ্ধৃতি তুলে রবীন্দ্রনাথ-কে 'বুর্জোয়া' কবি বলেছিলেন। 'নকশাল আন্দোলন'-এর সময় প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর-এর মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। নকশাল নেতা সরোজ দত্ত (প্রাক্তন সিপিএম) বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্‌ছি-মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি বসাচ্ছি।' এ-দেশের কমিউনিস্টরা দেশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ রক্ষণশীল গোষ্ঠীর কূপমণ্ডুক।

এসব হলো অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সাধারণ সম্পাদক বি.টি. রণদিভের রণনীতির ফসল। বি.টি. আর. তো সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন। তাঁর বিষয়ে— প্রয়াত সিপিএম-নেতা সুবোধ রায়ের আনপাবলিজড পুস্তক থেকে জানা যায়— বি. টি. আর. ট্রটস্কিকে নাকি মানতেন। সুবোধ রায়ের লিখিত পুস্তকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্তার কিছু কিছু কথা আছে। তাতে লেখা আছে— "বি. টি. রণদিভে-কে ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি ডিটেনশন ক্যাম্পে ছিলেন), কারণ বি. টি. আর বাইরে থাকলে কমিউনিস্টদের ঐক্য হতে পারবে না।"

আর এক কমিউনিস্ট নেতা এস.এ ডাঙ্গে বলেছিলেন, "আমার বন্ধু (?) বি. টি. আর. যখন সিপিএম-এ আছেন তখন নিশ্চয়ই সিপিএম গাড্ডায় পড়বে।" একথা সিপিআই ন্যাশনাল কাউন্সিলে বক্তৃতার সময়ে বলেছিলেন সিপিআই-এর কাউন্সিল-এরই এক সদস্য। একথা বলার কারণ হলো, কমিউনিস্টরা চিরদিনই একদেশাদর্শী— অভ্রংলেহি। আসলে শিল্পী, সাহিত্যিকদের পার্টির আওতায় এনেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক পি সি যোশী (পূরণ চাঁদ যোশী)। তাঁকে বিতাড়িত করে রণদিভে এসে এই বিদগ্ধজনদের দূরে সরিয়ে দিয়ে বৈপ্লবিক কাজ সমাধা করেছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। রুশ কমিউনিস্ট নেতা স্তালিনের ভয়ঙ্কর কীর্তি সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু স্তালিন-এর মতো নেতাও ম্যাক্সিম গোর্কিকে পছন্দ না করলেও গোর্কির কথাতেও কিছু বন্দীকে বন্দি-শিবির থেকে মুক্তি দেন। (সূত্র-রাইজ অ্যান্ড ফল অফ স্টালিন, স্টালিন-আইজাক ওয়েশ্চার)। জনপ্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রসদনে এক সংবর্ধনা সভায় বলেছিলেন, "আমরা গান গেয়ে গ্রামে-গঞ্জে শ্রমিক-কৃষককে বহু আশ্বাস দিয়েছিলাম। সেটা ছিল মিথ্যার আশ্বাস।" এই সভায় স্নেহাশু আচার্য উপস্থিত ছিলেন।

বুদ্ধ বাবুকে সংবাদপত্রে বিদগ্ধজন হিসাবে প্রচার করা হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী আছেন। এই দপ্তরের কাছে কেন হাতেগোনা বুদ্ধ-ভক্ত তৈরি হলো? কেন শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যাপক অংশকে টান্‌তে ব্যর্থ হলেন বুদ্ধ দেববাবু। বুদ্ধ বাবু নিজের স্তাবক শিল্পী-সাহিত্যিক নিয়ে একটা কোটারি গড়ে তুলেছেন। বুদ্ধ বাবুকে মোমের পুতুলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অহঙ্কারের তেজে গলে গলে পড়ে গিয়ে অন্তঃসারশূন্য কাঠামোটা বেরিয়ে এসেছে। তাইতো দেখি দিলীপ রায়ের মতো পার্টির লোক সখেদে বলেছিলেন— "বর্তমানে কানু স্যান্যালের মতো ত্যাগী নেতা চাই।" শুধু সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট নয়, শ্রমিকফ্রন্ট, ছাত্রফন্ট, যুবফ্রন্ট সব ফ্রন্টেই অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কারণ একটাই— ফ্রন্টগুলো সিপিএম-এর ডিপার্টমেন্ট-এ পরিণত হয়েছিল। কেবলমাত্র পার্টি সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য। ৩৫ বছরে জনসাধারণকে উইন-ওভার না করে হোস্টাইল করার কাজটা সুষ্ঠুভাবে সিপিএম নেতৃত্ব করেছেন। নিচের তলার কর্মীদের ঔদ্ধত্য এমন পর্যায়ে গেছে যে শুধু বিরোধী মতের লোক নয়, স্বমতের লোক যদি সমালোচনা করে থাকেন, তবে তিনি শত্রু বলে পরিগণিত হয়েছেন। বাম-ঐক্য চুরমার— কেবলমাত্র নির্বাচনে আসন ভাগাভাগির দোকানদারিতে পরিণত হয়েছে। এরা আবার ভিয়েতনামের কথা বলেন! ঐক্যবদ্ধ মোর্চার কৌশল ভিয়েতনাম-থেকেও শিখতে পারেনি।

ভুলে গেলে চলবে না যে শিল্পী সাহিত্যিকগণ আবেগপ্রবণ। তাই দেখা যায় যে জ্যাঁ পল সাত্রে একদিন সকালবেলা কফিন কাঁধে নিয়ে চলছিলেন। তাঁর অনুগামীরা তাঁর পিছু পিছু গিয়ে কবরস্থানে পৌঁছালে কফিন খুলে দেখা গেলো— তাতে লেখা আছে— 'কমিউনিজম'। সাত্রে ঘোষণা করলেন, 'কমিউনিজম ইজ ডেড— লং লিভ হিউম্যানইজম'।

গৌতমবাবু রাজারহাট নিয়ে চ্যালেঞ্জ — পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে পার্টির কর্মীদের একাংশের বাহবা পাচ্ছেন। কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তা চান না। সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পার্টির সম্পাদক বিমান বসু কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে রিপোর্টে পার্টির ধাক্কা সামলে ওঠার ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়েছেন, কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্বাস হয়নি। পার্টির শুদ্ধিকরণের জন্য এ-রাজ্যে পার্টি হম্বিতম্বি করছেন। এক হাজার জনকে বহিষ্কার করার খবর ছড়ানো হচ্ছে। এই বহিষ্কৃতরা বিরোধী শিবিরে গিয়ে পার্টির ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই কিছুজন তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। একটি ঘটনা— অনুপ রায় একজন প্রমোটার আবার সিপিএম-এর স্থানীয় নেতা, তাঁকে অপহরণ করা হয়। তিনি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে মুক্তি পেলেন। ৪০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিতে পারার মতো আর্থিক ক্ষমতা অনুপ রায়ের আছে। পার্টিতে বহু 'অনুপ রায়' তৈরি হয়েছে। সিপিএম-কে টাইট দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইতিমধ্যে ছক কষে ফেলেছেন।

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডাইরেক্টর রাজীব মাথুর এসেছিলেন এবং রাজভবনে এক গোপন বৈঠক করেছেন। যেখানে কিছু বর্তমান এবং প্রাক্তন পুলিশ কর্তাদের ডাকা হয়। মহাকরণকে জানানো হয়নি। স্মর্তব্য, বর্তমান রাজ্যপালও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্তা ছিলেন? এই সভায়

(এরপর ৭ পাতায়)

অন্য রকম

বিহার-নরেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিহার বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে নীতিশ কুমারের অভূতপূর্ব জয়লাভ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসে বিশেষজ্ঞরা মাথা ঘামিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যপ্রদেশে প্রকাণ্ড টাক বানিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। এহেন গলদঘর্ম অবস্থায় বিস্তর ঘাঁটাঘাটি করে তাঁরা রায় দিয়েছেন— নীতিশ কুমারের 'উন্নয়ন' কিংবা প্রবল কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি-ই বিহারে নীতিশ কুমারের জয়ের কারণ। এঁদের ভাবখানা দেখলে মনে হয় বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী যেন বানের জলে ভেসে এসেছেন। কিন্তু 'অন্যরকম' বলছেন বিহার-নরেশ ঘনশ্যাম তেওয়ারী। হার্ভাডের সরকারি কেনেডি স্কুলের স্নাতকোত্তর। বিষয়-পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তিনি দেখা করেন সুশীল মোদীর সঙ্গে। বলেন, "আমি আমার প্রতিভাটাকে রাজ্যের কাজে লাগাতে চাই। আমার কাছে কিছু তথ্য রয়েছে। যেগুলো জোড়া লাগালে একটা অধ্যায় রচিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। যাতে করে বিহারের উপকার হবে।" পাত্তা দেবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তবু মোদী পাত্তা দিয়েছিলেন। ঘনশ্যামের চোখের ভেতরের একটা জ্যোতি তাঁকে বোধহয় সম্মোহিতই করেছিল।

এদিক দিয়ে ঘনশ্যাম তেওয়ারি অবশ্য খুব-ই 'লাকি'। শুধু বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীরই নয়, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর অযাচিত বরদহস্তও ঘনশ্যামের মস্তিষ্কে আরোপিত হয়েছিল। তবে একটা প্রশ্ন ওঠা খুব সঙ্গত। এক্ষেত্রে ভাগ্যবান কে? ঘনশ্যাম না কি 'বিহার'? তার আগে বলে নেওয়া দরকার যে ঘনশ্যামের একটি দল রয়েছে। সেই দলের সদস্যদের গড় বয়স ২৭। সেই সদস্যদের মধ্যে কেউ পড়েন এদেশের আই আই টি-তে, কেউবা বিদেশের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

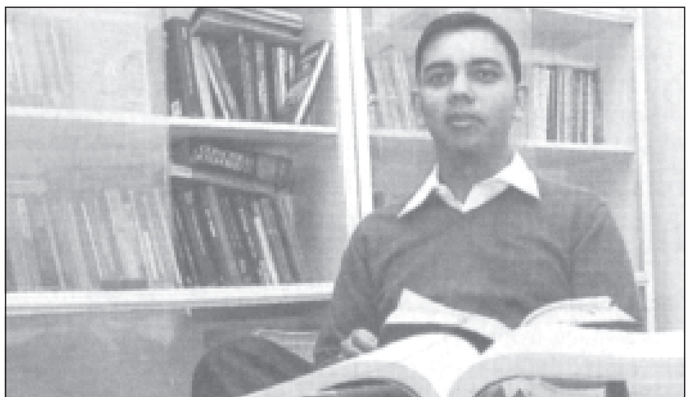
ঘনশ্যাম তেওয়ারী

প্রত্যেকেই বিহারের বাসিন্দা। কেবল একজন বাদ দিয়ে। মোটকথা সেই দলের সবাই উচ্চশিক্ষিত, সুপ্রিতিষ্ঠিত। বলাই বাহুল্য, এখানে পালের গোদা সেই ৩১ বছর বয়সী ঘনশ্যাম। রোহটাস জেলার গোরারি গ্রামের বাসিন্দা। শিক্ষারম্ভ বিহারেই। হার্ভাডে তাঁর পড়ার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সেইসঙ্গে কেল্লগ স্কুল অব্ ম্যানেজমেন্ট থেকে এম বি এ-ও পড়ছেন। কৃতী ছাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে 'অন্যরকম'-এর হলো টা কি?

কি যে বলেন! 'অন্যরকম' হবে না? ভূ-ভারতে কেউ কোনওদিন শুনেছে— কৃতী ও মেধাবী ছাত্র, বিদেশে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি, তবু স্রেফ নিজের রাজ্যের জন্য, একেবারে নিঃস্বার্থভাবে বিনা-পয়সার রাজ্যবাসীর সেবা করতে এগিয়ে আসছে একদল কৃতী; তাদের মেধা-বুদ্ধিকে সম্বল করে। আর তাদের এহেন উদ্যমে সবচেয়ে বড় সহযোগী বিহারের নীতিশ-সুশীল জুটি। একথা মানতে বাধা নেই, ঘনশ্যামের নেতৃত্বে বিহার পুঙ্গবরাই আজ বিজেপি-জেডি ইউ সরকারের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় মাথা। ইতিপূর্বে বিহার নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘনশ্যাম রাজ্যজুড়ে 'বিহার লিডারশিপ প্রোজেক্ট' চালিয়েছিলেন। আর তাতে করেই তাঁর মনে হয়েছে নীতিশ কুমারই বর্তমানে বিহারের জন্য সবচেয়ে উপযোগী নেতা। আর সুশীল মোদী-ই তাঁর যোগ্য সহযোগী। বোঝাই যায়, ঘনশ্যামের মনে হওয়াই শেষপর্যন্ত প্রতিফলিত হয়েছে সদ্য-প্রকাশিত বিহার বিধানসভার ফলাফলে। আর ঘনশ্যামেরা আশায় বুক-বাঁধছেন নীতিশ-সুশীল বিপুল ভোটে জিতে প্রত্যাবর্তন করছেন বলে। কারণ রাজ্যে উন্নয়ন করতে গেলে তার কুশীলবদের বড় দরকার এই দু'জনকে।

এবার একনজরে দেখে নেওয়া যাক ঘনশ্যামের সহযোগী বিহারের 'উন্নয়নে'র কুশীলবদের। জয়প্রকাশ (২৫), আই আই টি ২০০৭-এর ব্যাচ, বর্তমানে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। বিনোদ যাদব (৩৪), ঘনশ্যামের দলে একমাত্র অ-বিহারী, স্নাতোকোত্তর করেছেন মার্কিন মুলুকের কেনেডি স্কুল থেকে। রঞ্জন কুমার সিং (২৫) টাটা ইনস্টিটিউট অব্ সোস্যাল সায়েন্স থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছেন, বর্তমানে রাঁচিতে একটা বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার। মনীশ দীপক (২৭), পাটনাস্থিত মণিপাল ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পুজোর পর প্রতি বছরই উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চ লে ভিটে ছাড়ার হিড়িক পড়ে কেন?

সাধন কুমার পাল

পুজোর মরসুমের পর উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চ লে এখন চলছে রঙবেরঙের রিজার্ভ বাসের আনাগোনা। বিয়ের মরশুমে এরকম দু'একটি বাস ঢুকলে কার বিয়ের বাস, কি রঙের কতবড় বাস, কত বরযাত্রী/কনেযাত্রী এরকম নানা বিষয় নিয়ে কানাঘুষো জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। কিন্তু শারদীয়া উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই গ্রামের চেনা রাস্তায় হরেকরকম অচেনা বাসের আনাগোনা নিয়ে গ্রামের মানুষের কোনও কৌতুহল নেই। কারণ এই দৃশ্যটি এতটাই স্বাভাবিক যে মানুষ জানে প্রতিবছর যেমন পুজো আসে তেমনি পুজো শেষ হতে না হতেই কায়িক শ্রম নামক পণ্য বিক্রয় করার শর্তে অগ্রিম টাকা নিয়ে জীবন ধারণ করা অভাবী মানুষগুলিকে ইটভাটায় বা ভিন রাজ্যে মজুরী খাটাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যই 'ভাটার গাড়ি' বলে পরিচিত এই সমস্ত বাস গ্রামে ঢোকে। পেটের টানে বছরভর ভিন রাজ্যে থাকা মানুষগুলির মধ্যে উপরওয়ালার কৃপায় যাদের ভাগ্যে উৎসবের দিনগুলিতে নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটে তারাও এ সময় ভিটে ছাড়ে। ফলে পুজোর পর গ্রামবাংলার একটা ভালো অংশে এই ভিটেছাড়া মানুষগুলির অভাব জনিত এক ধরনের শূন্যতা, বিষণ্নতা বিরাজ করতে থাকে। খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, আয়লার মত ঝড় বা বিশেষ কোনও কারণে উৎপাদন কমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে গ্রামবাংলার মানুষের এই বহির্গমন দৃশ্য দেখলে যে কোন মানুষের মনেই এই প্রশ্ন আসবে যে এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমি কি আজ সত্যিই ক্ষুধার রাজ্যে পরিণত হয়েছে যে এখানকার মানুষকে পেটের ভাত জোগাড় করার জন্য ভিটে মাটি ছাড়তে হচ্ছে? ওয়াকিবহাল মহলের মতে দীর্ঘ বাম শাসনে পেটের টানে ভিটে ছাড়ারা বাংলার বাইরে এতটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে দেশের অনেক জায়গাতেই এখন সাফাইওয়ালা, রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ে, কাজের মাসী, পাহারাদার, ভাটার লেবার বলতে বাঙালিদেরই বোঝায়। স্বাভাবিক ভাবেই এ রাজ্যের পঞ্চ ায়েত ব্যবস্থা, ১০০ দিনের কাজ, সরকারের বিভিন্ন রকম জনকল্যাণমূলক কাজের প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠার সাথে সাথে আর যে প্রশ্নটি প্রবল ভাবে উঠবে তা হলো দীর্ঘ বামশাসনে কোন যাদুমন্ত্রবলে গ্রামাঞ্চ লে স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্ট কর্মসংস্থানগুলিও কি ধবংস হয়ে গেল যে সর্বহারা মানুষগুলিকে সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম ছাড়তে হচ্ছে? বামফ্রন্টের ঘোষিত ও গৃহীত কর্মসূচী ঘেঁটে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে জটিলতা সৃষ্টি হলেও এই সরকারের নেতৃত্বে থাকা সিপিএম দলের দলীয় কর্মসূচীগুলির দিকে তাকালে নিশ্চি ত ভাবে এই বাংলার গৌরবের পঞ্চ ত্ব প্রাপ্তির কারণগুলি সহজেই বোঝা যাবে।

১৯৭৭ সাল। বামফ্রন্টের মধ্যমণি সিপিএম ক্ষমতায় এসেই গরীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করল। এই স্বপ্ন সাকার করতে প্রথমেই শুরু হলো এই বাংলার ঐতিহ্যগত ধারাগুলোকে বিদেয় করে দেওয়ার কাজ। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শুরু হলো প্রচলিত মূল্যবোধ, মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তি, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট করে দিয়ে সে জায়গায় এক রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের কাজ। যেমন, এই বাংলার গ্রামীণ সমাজে কৃষক, ভূমিহীন কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে একটি আত্মীয়তার বন্ধনের ঐতিহ্য বরাবরই ছিল। গ্রামের কৃষকরাই ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি স্বরূপ। গ্রামের শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তিরা স্বগুণে স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রামীণ সমাজের সর্বজনমান্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। সিপিএম ক্ষমতায় এসে প্রথমেই শোষক আর শোষিতের তত্ত্ব আওড়ে কৃষক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী ঘৃণার বিষ ঢেলে দিয়ে পার্টি লাইনে কথা বলতে অনিচ্ছুক শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়াশীল গরীবের শত্রু আখ্যা দিয়ে গ্রামীণ সমাজে শ্রেণী সংঘর্ষের নামে এক লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরি করল।

বামশাসনের গোড়া থেকেই সিপিএমের লড়াইয়ের ময়দানে মূলত দুটো প্রতিপক্ষ ছিল। এক, বুর্জোয়া ধনীর দালাল কেন্দ্রীয় সরকার। দুই, শ্রেণী শত্রু বলে চিহ্নিত গ্রাম বাংলার অ-সিপিএম আমজনতা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছিল অনেকটা ওঝার ভূত তাড়ানোর মতো ব্যাপার। কারণ সিপিএম নেতারা কেন্দ্র বিরোধী বক্তৃতায়, আলাপচারিতায় এতটাই বাজার গরম করতেন— যে গ্রামবাংলার মানুষের কাছে কেন্দ্র মানে সর্বহারার শত্রু এমন এক অশরীরী সত্তা মনে হোত যে এই অদৃশ্য শত্রুটিই যেন অনাহার দরিদ্র বেকারি থেকে শুরু করে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার জন্য দায়ী। কেন্দ্রকে যেহেতু কাছে পাওয়া যায় না (তখন মিডিয়ার এত রমরমা ছিল না, ফলে সিপিএম নেতৃত্বের ভাষাই ছিল তথ্যের একমাত্র উৎস), সেজন্য ঘুঁষি উচিয়ে স্লোগান ও কেন্দ্রবিরোধী আগুন ঝরানো বক্তৃতাই ছিল এই লড়াইয়ের একমাত্র অস্ত্র। সিপিএম-এর প্রত্যক্ষ লড়াইটা ছিল মূলত দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ অর্থাৎ অসিপিএম আমজনতার বিরুদ্ধে। পার্টির খাতায় নাম লেখাতে অনিচ্ছুক এই মানুষগুলিকে প্রথমে ভাতে মারার চেষ্টা করা হোত। তাতে সফল না হলে ছিল হাতে মারার ব্যবস্থা।

অবাধ্য কৃষক পরিবারগুলিকে ভাতে মারার অস্ত্রটির পোশাকি নাম ছিল 'টার্গেট'। 'পার্টির দণ্ডাদেশ' নামে পরিচিত যে সমস্ত কৃষক পরিবার এই টার্গেট-এর আওতায় আসত, নিয়ম ছিল পার্টির নির্দেশ ছাড়া সেই সমস্ত পরিবারে কোনও শ্রমিক কাজ করতে পারবে না; এদের পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠানেও কেউ যেতে পারবে না। পাড়া প্রতিবেশী তো দূরের কথা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম বলবৎ ছিল। এমনও দেখা গেছে সামাজিক ভাবে বয়কট হওয়া এই সমস্ত পরিবারে কারো মৃত্যু হলে, মৃত দেহ সৎকার করতেও কেউ যেতে সাহস করত না। কারণ পার্টির আদেশ অমান্য করার অর্থ তার কপালেও একই ফতোয়া নেমে আসা। সে সময় সিপিএম-কে আট টাকা দশ পয়সা মজুরির দাবিতে মিছিল মিটিং করতে দেখা যেত। কিন্তু বাজার চলতি মজুরির দ্বিগুণ এই মজুরিটি শুধুমাত্র টার্গেটকৃত পরিবারগুলো থেকেই আদায় করা হতো। দিনের পরদিন লেবার বন্ধ করে দিয়ে 'টার্গেট'কৃত পরিবারকে দুর্বল করতে না পারলে এদেরকে প্রয়োজন ছাড়াই লেবার দিতে বাধ্য করা হোত। এমনও দেখা গেছে লেবাররা সারাদিন বসে থেকে সন্ধ্যাবেলা আট টাকা দশ পয়সা মজুরি বুঝে নিয়েছে। এই সমস্ত মজুরি মেটাতে কৃষককে ক্ষেতের ফসল, গৃহপালিত পশু এমন কি বাড়িতে থাকা বাঁশ ও গাছ পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে এমন নজিরও আছে। তবে এই আট টাকা দশ পয়সা মজুরির গোটাটাই লেবাররা পেত না। এর একটা অংশ পার্টির সংগ্রামী তহবিলে জমা দিতে হোত। যে সমস্ত লেবার এই ফতোয়া অমান্য করত প্রতিক্রিয়াশীল ধনীর দালাল তকমা দিয়ে তাদেরকেও এলাকা ছাড়া করে দেওয়া হোত।

শ্রেণী শত্রু বলে চিহ্নিত কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য আরেকটি অমোঘ অস্ত্র ব্যবহৃত হোত যার নাম অপারেশন বর্গা। এই বাংলার গ্রামীণ সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা এতটাই ছিল যে অনেক কৃষকই তার জমির একাংশ প্রতিবেশী ভূমিহীন কৃষককে দিয়ে ভাগচাষী হিসেবে চাষবাস করাত। সার, বীজ এমনকি জমিতে লাঙল দেওয়ার জন্য নিজের বলদ জোড়া দিয়েও সাহায্য করত এই ভাগচাষীদের। এতে কৃষি ক্ষেত্রে কাজের পরিধি, উৎপাদন যেমন বাড়ত তেমনি অনেক ভূমিহীন কৃষক এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জমি কেনার সামর্থ্য অর্জন করে ক্ষুদ্র বা মাঝারি কৃষকে পরিণত হোত। কিন্তু সিপিএম ক্ষমতায় এসে এই ভাগচাষীদেরও লেলিয়ে দিল এক সময় সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ানো সম্পন্ন কৃষক পরিবারটির বিরুদ্ধে। সরলমনা পরমাত্মীয়ের মতো ভাগচাষী রাতারাতি আইনসঙ্গত বর্গাদারে পরিণত হয়ে এতদিন তার মাথার উপর ছাদ হয়ে থাকা কৃষক পরিবারটিকে মানে সম্মানে, অর্থনৈতিক অবরোধে সর্বস্বান্ত করে দেওয়ার লড়াইয়ে সামিল হলো। ফলে গ্রামে গ্রামে অনেক বহুফসলি জমি এক ফসলি বা পতিত জমিতে পরিণত হলো। কারণ, এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এতটাই তলানিতে ঠেকল যে বর্গা রেকর্ড হওয়ার ভয়ে কোনও জমির মালিকই প্রতিবেশী তো দূরের কথা, কাছের লোককেও চাষবাস করার জন্য জমি দিতে সাহস করত না।

অবাধ্য কৃষক পরিবারগুলোকে টাইট দেওয়ার আরেকটি অস্ত্রের নাম ছিল চাঁদা। মিছিল, মিটিং, বারোমাসে তেরো সম্মেলন —যাই হোক না কেন এদেরকে চাঁদা দিতে হোত পার্টি সমর্থকদের থেকে অনেক বেশি হারে। বিশেষকরে পৌষ মাঘ মাসে ফসল তোলার সময় সিপিএম পার্টির পক্ষ থেকে মরসুমী চাঁদা নামে যে তহবিল সংগ্রহের কাজ চলত তা ছিল পার্টি সমর্থকসহ সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে এক আতঙ্কের কারণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীরা সেই কংগ্রেসী আমলের লেভির আদলে রক্ত জল করা পরিশ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসল চাঁদা হিসেবে দিতে বাধ্য থাকত। কারণ চাঁদা দিতে অপারগ হওয়া বা অস্বীকৃত হওয়ার অর্থ ছিল তার উপর 'টার্গেট' নামক পার্টির দন্ডাদেশ নেমে আসা।

যাই হোক সিপিএম ক্ষমতায় আসার দশ বছরের মধ্যেই তাদের দলীয় কর্মসূচী-গুলির ফল মিলল। গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি স্বরূপ কৃষক পরিবারগুলির বেশির ভাগই সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ঘরের বউ ছেলে-মেয়েদের দিয়ে মাঠে কাজ করিয়ে 'টার্গেট' নামক অস্ত্রের মোকাবিলা করতে গিয়েও অনেকে শেষরক্ষা করতে পারল না। অনেকেই নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্বাস স্বাভিমান বিসর্জন দিয়ে পার্টির কাছে আত্মসমর্পণ করে টিকে থাকার পথ বেছে নিল। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামীণ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ কমতে থাকল উল্লেখযোগ্য ভাবে। এদিকে অপারেশন বর্গা ও ভূমি সংস্কারের উত্তাপও শীতল হতে শুরু করল। কারণ, যে সমস্ত ভূমিহীন কৃষক জমির মালিক হলো বা বর্গাদার হিসেবে স্বীকৃতি পেল সামর্থের অভাবে তাদের বেশির ভাগই জমি ধরে রাখতে পারল না। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ভাগ চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এরা নির্ভেজাল কৃষিমজুরে পরিণত হলো।

সিপিএম-এর হিংসাত্মক দলীয় কর্মসূচীর ফলে শুধু যে কৃষির ক্ষতি হলো তা-ই শুধু নয় গ্রামবাংলায় স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠা কুটির শিল্পগুলোও ধবংস হয়ে গেল। যেমন কোচবিহার জেলার মাঘপালা গ্রামের তাঁতের শাড়ি ও গামছা এক সময় জেলার বাজার দাপিয়ে বেড়াত। শুধুমাত্র সচ্ছল মালিকরাই নয়, একটি বা দুটি হস্তচালিত তাতের মালিককেও বুর্জোয়া, পুঁজিপতি হিসেবে তুলে ধরে তাঁত শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে উচ্চ মজুরির দাবিতে এমন আন্দোলন গড়ে তোলা হলো যে ওই গ্রামের তাঁত শিল্প সম্পূর্ণ ভাবে ধবংস হয়ে গেল। মাঘপালার তাঁতশিল্প এখন ইতিহাস। ফলে, যে পশ্চিমবাংলায় এক সময় বিহারী, উড়িয়া শ্রমিকরা দলে দলে কাজ করতে আসত সেখানে উল্টো স্রোত বইতে শুরু করল। এই বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কুটির শিল্পের মালিক শ্রমিকরা দলে দলে কাজের খোঁজে পাড়ি জমাতে লাগল কেরল, দিল্লি, গুজরাত, বিহার, ওড়িশা, নাগাল্যান্ড, মণিপুরের মতো রাজ্যগুলিতে। শিক্ষিত, সজ্জন ও চাকুরেরা মান সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে দলে দলে গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিতে লাগল শহরাঞ্চ লে। এর বিপরীতে কমরেড নামধারী নব্য মাতববরেরা রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে থাকল।

সে সময় বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু মানুষ যাদের বংশগত বা জিনগত কংগ্রেসী বলা হোত তাদের অনেকেই একক প্রয়াসে স্থানীয়ভাবে সিপিএম-এর এই সমস্ত অন্যায় জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর চেষ্টা করলেন। কারণ দিল্লির রাজনীতির পরস্পর সহযোগিতার সমীকরণ রক্ষার জন্য দল হিসেবে কংগ্রেস কোনওদিনই সিপিএম-এর অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিবাদী কংগ্রেস কর্মীদের পাশে দাঁড়ায়নি। যার পরিণতি হিসেবে ১৯৮৪ সালে মাথাভাঙ্গার শিবপুর গ্রামের গণহত্যা, লুঠ-পাট ও অগ্নি-সংযোগ কিংবা ১৯৮৬ সালে এই মাথাভাঙ্গারই ইচ্ছাগঞ্জ গ্রামের উচ্চশিক্ষিত স্বাধীনচেতা মানুষ মহেশ বসুনীয়ার খুনের মতো অনেক ঘটনা অবাধে ঘটতে পেরেছিল।

সবমিলিয়ে বলা যায় এই বাংলার গ্রামগুলো যতই দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়ুক না কেন সিপিএম কিন্তু তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেল। গরীব মানুষের অধিকার আদায়ের নামে, সর্বহারার ক্ষমতায়ণের নামে গড়ে তোলা উগ্র দলীয় আন্দোলন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামগুলির নেতৃত্ব এমন একদল মানুষের হাতে গেল যে শিক্ষা-দীক্ষায়, মানবিক গুণাবলীতে, বিপদে- আপদে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর রেকর্ডে এরা কোনওভাবেই সমাজের মাথা হয়ে ওঠার মতো যোগ্য ব্যক্তি ছিল না। গ্রামীণ সালিশী থেকে শুরু করে যে কোনও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে এই কমরেডরাই শেষ কথা হয়ে উঠল। যার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে পঞ্চ ায়েত ব্যবস্থা, গণবন্টন ব্যবস্থা নামক অমৃতভান্ড সহ স্থানীয় প্রশাসনে দলতন্ত্র নামক বৃক্ষটি এমনভাবে শেকড় বিস্তার করল যে সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী ও প্রশাসনিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চি ত হয়ে গ্রামবাংলার মানুষ আরও নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে গেল। তার পরিবর্তে দল ও দলের নেতারা ধনে-সম্পদে ফুলে ফেঁপে উঠে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারি হয়ে গেল। তবে চলমান পরিবর্তনের হাওয়ায় পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে ছে। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে সম্মানের সাথে নিজের ভিটেতে থাকার অধিকার ফিরে পাওয়ার আশায় এ রাজ্যের হাজার হাজার ভিটেছাড়া মানুষের দৃষ্টি কিন্তু এখন আসন্ন চূড়ান্ত পরিবর্তনের দিকেই।

বামশাসনের গোড়া থেকেই সিপিএমের লড়াইয়ের ময়দানে মূলত দুটো প্রতিপক্ষ ছিল। এক, বুর্জোয়া ধনীর দালাল কেন্দ্রীয় সরকার। দুই, শ্রেণী শত্রু বলে চিহ্নিত গ্রাম বাংলার অ-সিপিএম আমজনতা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছিল অনেকটা ওঝার ভূত তাড়ানোর মতো ব্যাপার। কারণ সিপিএম নেতারা কেন্দ্র বিরোধী বক্তৃতায়, আলাপচারিতায় এতটাই বাজার গরম করতেন— যে গ্রামবাংলার মানুষের কাছে কেন্দ্র মানে সর্বহারার শত্রু এমন এক অশরীরী সত্তা মনে হোত যে এই অদৃশ্য শত্রুটিই যেন অনাহার দরিদ্র বেকারি থেকে শুরু করে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার জন্য দায়ী।

কেরলে স্থানীয় নির্বাচনে পর্যুদস্ত সি পি এম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ফের সিপিএমের চূড়ান্ত ব্যর্থতা পরিলক্ষিত। তবে এবার বাংলায় নয়— কেরলে। গত ৩১ অক্টোবর কেরলে স্থানীয় নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা গেল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফের কাছে সম্পূর্ণভাবে ধরাশায়ী সিপিএম শিবির।

প্রায় চার দশক ধরে রাজ্যের যেসব কর্পোরেশন, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের উপর আধিপত্য করে এসেছে সিপিএম, ইউডিএফের এক টানে সেসব কিছুই এখন অতীত। কিন্তু কেন এই ব্যর্থতা? কেন ভেঙে পড়ল তিল তিল করে গড়ে তোলা সিপিএমের এই সাম্রাজ্য?

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, "কেরলের বুকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সিপিএম সর্বদাই মুসলিম ও খৃস্টানদের সঙ্গে 'তোষামোদ সুলভ' আচরণ করে এসেছে। এমনকী রাজ্যে সন্ত্রাসকেন্দ্রিক নির্বাচনী এলাকাগুলিতেও নিজেদের 'ভোটবাক্স' ভর্তি করার জন্য নরম মনোভাব দেখিয়েছে সিপিএম নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ। সিপিএমের এই কৌশল কার্যকরও হয়েছিল ২০০৪ সালের সংসদ ও ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। সেই সময় সিপিএমের 'ক্যারিশমা' বজায় রাখার পেছনে মূল অস্ত্রই ছিল সংখ্যালঘুদের ভোট। কিন্তু এখন সংখ্যালঘুরাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সিপিএমের এই কৌশল এখন বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে।"

সংখ্যালঘুরা এবার ভোট দিয়েছেন ইউ ডি এফের ঝুলিতে। ডাঃ কে এস মনোজ, এ পি আব্দুল্লা কুট্টি, শিবারমনের মতো প্রাক্তন সাংসদদের সিপিএম-শিবির ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেওয়াকেও অনেকে সিপিএমের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করছেন।

কেরলে ৫৯টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সিপিএম নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ পেয়েছে মাত্র ২০টি। বাকি ৩৯টি পুরসভাই দখল করছে ইউ ডি এফ। ১৪টি জেলা পঞ্চায়েতের মধ্যে সিপিএম দখল রাখতে পেরেছে মাত্র ৮টি। সিপিএম নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ-কে অনেক পেছনে ফেলে ইউ ডি এফ ৯২টি ব্লক এবং ৫৮২টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে।

বিজেপি তিরুবনন্তপুরম করপোরেশনে ৭টি আসন দখল করেছে। এছাড়া ত্রিশূর এবং কোচি করপোরেশনে ২টি করে আসনে জয়ী হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে বিজেপির মোট জয়ী প্রার্থীর সংখ্যা ৯০ জন। ব্লক পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচনে বিজেপি-র জয়ী প্রার্থীদের সংখ্যা ৭ জন। করপোরেশন, মিউনিসিপালিটি, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের এই নির্বাচনে বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের সংখ্যা ৬০০ জন। মোটামুটি গত নির্বাচনী ফলাফলেরই পুনরাবৃত্তি।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কুমারস্বামীদের মুখোশ খুলে দিতে চান ইয়েদুরাপ্পা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে বিধানসভায় পরপর দু'বার আস্থা ভোটে জয়ী হওয়া এবং ১১ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কারের দৃঢ়তা দেখানোর পর কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়াদুরাপ্পা এবারও শেষ হাসিটি হাসলেন। নিজেদের দলের দুর্নীতিকে লঘু করে দেখানোর জন্য কংগ্রেস ও জোট শরিক ডি এম কে এবং এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম জমি-কেলেঙ্কারি নিয়ে যেভাবে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, সেখানেও ইয়েদুরাপ্পা মাথা নোয়াননি। বরং এবার তিনি নিজেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরোধীপক্ষের মুখোশ খুলে দিতে চাইছেন। দিল্লী থেকে দলীয় পদাধিকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে সম্প্রতি নিজের শহর শিকারিপুরে ফিরেছেন তিনি। পঞ্চাশ বছর আগে এই শহর থেকেই নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল তাঁর। এখানেই তিনি জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে যেসব ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল এবার তিনি সেই অভিযোগকারীদেরই মুখোশ খুলে দেবেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া ও তার পরিবারের, বিশেষত এইচ ডি কুমারস্বামীকে তিনি ছেড়ে কথা বলবেন না। ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, ওরা যেসব দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন তা তিনি ধারাবাহিক ভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করে যাবেন। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না দেবগৌড়া ও তার পুত্র তা বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি জানিয়েছেন, 'অভিযোগকারীদের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য আমার কাছে প্রামাণিক তথ্যাদি আছে।' কর্ণাটক সরকার ও বিজেপি এই বিজ্ঞাপনের খরচ যোগাবে।

ইয়েদুরাপ্পা

ব্যাঙ্গালোর ডেভলপমেন্ট অথরিটি (বি ডি এ) 'জি' ক্যাটাগরি ভুক্ত যেসব জমি বিগত কংগ্রেস ও জেডি (এস) সরকারের আমলে বিলি করা হয়েছিল, তার বিশদ তালিকা দেখিয়ে তিনি জানান, শুধু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর ২০ মাসের শাসনকালেই সব থেকে বেশি জমি বিলি-বণ্টন করা হয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, মহীশূর আরবান ডেভলপমেন্ট অথরিটির (এম ইউ ডি এ) কমপক্ষে ৩২টি প্লট দেবগৌড়া, কুমারস্বামী এবং এইচ ডি রেভেন্না নিজেদের আত্মীয়দের নামে নিয়েছেন। প্রথম বিজ্ঞাপনটিতেই তিনি জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত এইচ ডি ডি পরিবারের ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রকাশ করে দেবেন।

রক্ষণশীল গোষ্ঠীর কূপমণ্ডুক

(৫ পাতার পর)

নাকি প্রাক্তন পুলিশ কর্তাদের মধ্যে তৃণমূলে যোগদানকারী এবং তৃণমূলের সহানুভূতিশীল পুলিশ কর্তারা ছিলেন বলে শোনা যাচ্ছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৭১-৭২-এ পি এন হাকসার কলকাতায় এসেছিলেন এবং সিপিএম বধের ছক কষে দিয়েছিলেন। একথা এক প্রয়াত বরিষ্ঠ সাংবাদিক আমায় তখন বলেছিলেন। আর এক সূত্রে জানা গেছে যে উত্তর কলকাতায় জনৈক 'নাগ'-এর বাড়িতেও এক গোপন সভা হয়।

আরও খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, মাওবাদীদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য 'র' (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং) কাজে নাকি নামিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। 'র' কি সিপিএমকে ছেড়ে দেবে? সিপিএম নেতারা খালি ভাবছেন শক্তির জোরে বন্দুকের জোরে জনগণের কাছে 'মুক্তিদাতা' হিসাবে উপস্থিত হবেন। ভুলপথ। পরাজয় নিশ্চিত।

একটি উপন্যাসের বহুস্বর : বাংলাদেশের অন্তর্বাস্তব

অচিন্ত্য বিশ্বাস

কোনও উপন্যাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে অপেক্ষা করা ভালো। কিন্তু অপেক্ষা করতে পারলাম না। বাংলা ভাষায় এরকম একটি উপন্যাস আগে পড়িনি। বলতে পারতাম পড়িনি বলা ভুল, এরকম আরও দুটি লেখা আমার পড়া। তসলিমা নাসরিন-এর 'লজ্জা' আর হুমায়ুন আজাদেরই আর একটি উপন্যাস 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' (ডিসেম্বর ২০০৩) আমার পড়া। কিন্তু '১০,০০০ এবং আরও ১টি ধর্ষণ' (ফেব্রুয়ারি ২০০৩) পড়ে আমার মনে হলো এটি সম্পর্কে না লেখা ঠিক হবে না। বাংলা ভাষার পাঠকদের উপন্যাসটি সম্পর্কে জানা উচিত। উপন্যাসটিতে বর্ণিত যে ভয়ঙ্কর বাস্তব তার কথা জানা উচিত। শুধু সামাজিক বাস্তব নয়, ওই উপন্যাসে উপস্থাপিত যে শিল্পকলা তার আড়ালে লেখকের কণ্ঠস্বর বস্তুত বাংলাদেশের একটি অবদমিত কণ্ঠস্বর— এই ভাষ্যটি উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

উপন্যাসে লেখক (author) যখন কর্তৃত্ব করেন তখন উপন্যাস হয়ে ওঠে একমাত্রিক (monophonic), কিন্তু উপন্যাসকে শিল্প গুণে অন্বিত হতে হলে লেখক (author) কথক (narrator) আর সৃষ্ট চরিত্র (character)-এর নানান ভাষ্য মিলে মিশে তৈরি হয় এক আশ্চর্য মায়া। তাকে উপন্যাস হয়ে ওঠা বা novelisation-এর প্রথম শর্ত বলে মনে করেছেন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন। এই শর্ত পূরণ হলে উপন্যাস হয় বহুস্বর যুক্ত (polyphonic) '১০,০০০, এবং আরও ১টি ধর্ষণ'— হুমায়ুন আজাদের এমনি এক উপন্যাস যেখানে লেখক— কথক আর চরিত্রের টানাপোড়েনের বুনটে একটি ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক পরিস্থিতির বহুস্বর এমনভাবে উপস্থাপিত করেছেন, যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বেশি পাইনি।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব ব্যর্থ হয়ে গেল। ১৯৪০-এ লাহোর-অধিবেশনে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবি তোলে— ভারতবর্ষের মুসলমানরা আসলে ভিন্ন জাতি। দ্বিজাতি-তত্ত্বের এই দাবি পূরণ হয় ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল এর চব্বিশ বছর পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। মিথ্যা হয়ে গেল দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শ ও ভিত্তি। তবে তারপর চার বছর যেতে না যেতেই ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান স্বগৃহে সপরিবার নৃশংসভাবে নিহত হলেন —বাংলাদেশ ফিরে গেল পাকিস্তানের পথে। হুমায়ুন আজাদের উপন্যাসটি বাংলাদেশের পশ্চাদপদতার দলিল। তবে উপন্যাস তো রাজনীতির ইতিহাস নয়— মনের ইতিহাস। সেই মনটির পরিচয় পেতে উৎসাহী— পাঠক '১০,০০০, এবং আরও ১টি ধর্ষণ' পড়ে দেখতে পারেন।

প্রথমে আসি নামটির কথায়। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হবার পর সংখ্যালঘুদের উপর সীমাহীন বর্বর অত্যাচার, বিশেষ করে হিন্দু নারীদের উপর পাশবিক ধর্ষণের মতো ঘটনা বেড়ে গেছে। খুব কম সময়ই মুসলমান মেয়েরা এইরকম অত্যাচারের শিকার হয়। হুমায়ুন আজাদের উপন্যাসের নামটিতে সেইরকম ব্যতিক্রমী একটি ঘটনার ছবি আঁকা হয়েছে। অজস্র হিন্দু নারীর উপর বলাৎকার (দশ হাজার একটি প্রতীক-সংখ্যা)-এর পাশে ময়না ওরফে মোসাম্মৎ ফতেমা বেগম নামের এক কিশোরীর উপর চারটি পশু-স্বভাব যুবক (আরশাদ, আজম, আলতাপ আর সাদ্দাম) যারা ('ইসলামিক নাশালিজম' কায়েম করার বাসনায় 'পাওয়ার'-এ এসেছে) ধর্ষণ করে গেছে। ফুলের মতো সুন্দর, লেখাপড়ায় ভালো মেয়েটির জীবন হয়েছে দুর্বিসহ। এ উপন্যাস সেই ব্যতিক্রমী একটি ঘটনার দুঃসহ বিবরণ।

আগেই লিখেছি, এই লেখা একমাত্রিক নয়। ময়না ব্যক্তিত্ব আর স্বচ্ছ দৃষ্টি— জীবন দেখার একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গি উপন্যাসে তৈরি করেছে সমান্তরাল একটি ভাষ্য। ময়নার কয়েকটি সই আছে। ইছামতীর তীরে কেদারপুর নামে এক অখ্যাত এই গ্রামে ময়নার সখীরাও ময়নার সঙ্গে স্থানীয় বিদ্যালয়ে যেত। ফজু-রহিমা-ফুলি তাদের নাম। রংপুর থেকে সন্দীপ, টেকনাফ থেকে কুষ্টিয়া বিশাল বাংলাদেশের মাত্র কয়েকটি কিশোরী। তারা ময়নার মতো ধর্ষিতা নয় কিন্তু আমর্ম বোঝে ইসলামিক ন্যাশনালিজমের স্বরূপ। গ্রামে ছিল পশ্চিমপাড়ার 'মসজিদ'। তার পাশে নতুন একটি ঝকঝকে লাল ইটের মসজিদ গড়ে তুলেছে জুলমত আলি চাকলাদার। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জুলমত ছিল 'রাজাকার'— সে এখন কেদারপুর গ্রামের ধর্ম-সমাজের শাসক। এক সময় তাকে কোলে নিয়ে ভিক্ষে করত তার মা— 'অনেক বছর পর' সেই জুলমত 'ধানখেত কিনে মসজিদ আর হাফিজিয়া কোরকানিয়া মাদ্রাছা' (৩৬ পৃ.) দিয়েছে। তিনি চারটে বউ, 'আগে আরও তিন চারটাকে সে তালাক দিয়েছে'— সর্বশেষ বউ— 'তার নাতিনের সমান'। আর কেদারপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান বেলায়েত মওলানা। এদের ব্যবহার, চালচলন, মতলব আর ধর্মের নামে ঘোর পুরুষবাদী ধ্যান ধারণা বিশ্লেষিত হতে থাকে ময়না-ফুলি-রহিমা আর ফজুর চোখ দিয়ে।

হুমায়ুন আজাদ

এই চোখ, স্বতন্ত্র— হয়ত ইসলাম ধর্মসম্মত নয় কিন্তু মানবিক। আর হুমায়ুন দেখিয়েছেন এই স্বতন্ত্র দৃষ্টি কোণটির পুরোনো কিছু সূত্রও। ময়নার স্নেহময়ী দাদা— তার মায়ের চাচী-শাশুড়ি হরি-র কথা সামান্য বলে নিই ঃ '...বিধবা হওয়ার পর অনেক বছরে তার অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে, সাহসও বেড়েছে;গ্রামের মান্যগণ্য পুরুষদের দু-তিন-চারটি তার হাতে অল্প স্বল্প জখম হয়ে অনেক আগেই কবরের অনন্ত শান্তির ভেতরে ঢুকে গেছে...। একটির দিকে সে ভর দুপুরবেলা কালো পাতিল ছুঁড়ে দেয়ার গুনার কাজ করেছিলো, ঠাশ ক'রে গিয়ে পাতিলটি লেগেছিল মোহাম্মদ আব্দুল খালেক খাঁর মাথায়, তার মাথাটা যতোটা ভেঙেছিলো তার থেকে অনেক বেশি ভেঙেছিলো মান সম্মান'। (১৬ পৃ.)। এভাবেই এক দুশ্চরিত্রের 'মেহেদিমাখা চাপদাড়ি ধরে' আটকে রেখেছিল হরি, মৌলবি ছব্দুর আলি ছাহেব-এর সেই অপমানও করতে পেরেছিল দুর্জয় সাহসে। বিচার সভায় যেতে চায়নি কখনো। এই বিদ্রোহী নারী সত্তার মধ্যে হয়ত ময়নার প্রতিবাদী চেতনার উৎস সামান্য মিলবে। তার মা বিদ্রোহী নয়— কিন্তু পুরুষ শাসনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিতেও পারেনি। তথাকথিত ইসলামিক ন্যাশানালিজমের ধুয়াতে দেশ বদলে গেল, ময়নার বাবা জব্বর শেখের মতো সাধারণ চাষীও যখন 'রাঙ্গা মজিদে সাইজ্যাগুইজ্যা নমজ পড়তে' যায়, তখন 'ওয়াজ'-এর কথা রাত জেগে শোনার ইচ্ছা হয়নি ময়নার মায়ের। ময়নার কথার উত্তরে তার অজুহাত ঃ 'অনেক ওয়াজ শুনছি, হেই একই পুরাইন্যা কতা। তরা হোন, আমার ঘোম পাইতে আছে।' (৪৫ পৃ.)। এই ঘুম— উপেক্ষার মতো মনে হয়। হরির বিদ্রোহ আর ময়নার মা-এর উপেক্ষার উত্তরাধিকার ময়নার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

যাই হোক চার সখি 'ওয়াজ' শুনছিল আর তাদের মনে হচ্ছিল এই সমাজ, ধর্ম, দেশ তাদের মতো নারীদের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক। 'ওই ওয়াজই বদলে দিয়েছিলো ওদের জীবন। ওরা ভয় পাচ্ছিলো, হাহাকার করছিলো, লজ্জায় কুঁকড়ে উঠছিলো।' (৪৫ পৃ.)। ধর্মসভায় ধর্মনেতা বেলায়েত বলতে থাকে 'পুরুষের দরকার না হইলে আল্লাপাক নারী সৃষ্টি করিতেন না, কাজেই নারী পুরুষের অধীনে থাকিবে।' (৪৭ পৃ.)। তার দুঃখ 'আমাদের দেশ এখন নারীর অধীনে' (৪৮ পৃ.)। যাই হোক, মেয়েদের শয়তান ছাড়া কিছুই ভাবে না বেলায়েত; তার নিদান 'নারীকে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে' (৫১ পৃ.), ইস্কুল, কলেজ, 'ইউনিভার্সিটি'তে মেয়েদের পাঠালে ভয়ঙ্কর পাপ ('কবিরাগুনা') হবে। কার্যত ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল তাদের— তারা বিচ্ছিন্ন হলো, বাড়ির কাজ করতে বাধ্য হলো। এখন 'তারা একলা কাঁদে' 'একসঙ্গে বসে কাঁদে'। ময়নার ইচ্ছা ছিল বেগম রোকেয়ার মতো শিক্ষিত হবে— কিন্তু তা সম্ভব হলো না। ধর্ষিতা এই কিশোরী আর তার সইদের হাহাকার উপন্যাসে সঞ্চারিত ধ্বনিত স্পন্দিত করেছেন হুমায়ুন।

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি একজন প্রগতিশীল শিক্ষক— ফরিদ স্যার। তাকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান সহকর্মীরা 'মুরতাদ' বলে গণ্য করেছে। রুচিশীল এই মানুষটি সম্ভবত লেখক হুমায়ুনের পরিবর্ত ব্যক্তিত্ব (alter ego)। তবে এই কণ্ঠস্বরটি চাপা পড়ে গেছে। একবার মাত্র রাঙ্গা মসজিদে যখন ধর্ষিতা ময়নার পিতা জব্বরকে ধর্মান্ধ মানুষগুলি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সমালোচনা করছে, সমালোচনা করেছে ময়নাকে ('তাহার বেপর্দার জন্যেই এই জেশ ঘটিয়াছে, পর্দায় থাকিলে এই জেশ হইত না।'— ৮৭ পৃ.) আর দিয়েছে ফরমান— 'তাহার গর্ভে যে-সন্তান আসিয়াছে, সে কোন গুনা করে নাই, আল্লাতাআলা তাহাকে পাঠাইয়াছে, তাহাকে নষ্ট করা গুনা' (৮৮ পৃ.)। এসময় কয়েকটি যুবক প্রতিবাদ করেছে। বিশেষত রাঙ্গা মসজিদের ইমাম যখন বলে ময়নাই তার উপর অন্যায় বলাৎকার ('জেনা')-এর জন্য দায়ী, সন্তান প্রসবের পর তাকে এর শাস্তি পেতে হবে, তখন তাদের প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। পরের শুক্রবার থেকে 'পশ্চিমের টিনের মসজিদে' নমাজ পড়ার সিদ্ধান্ত হয়— বিজলি পাখার লোভে 'ইস্মাগলারের দালানের মজিদে' নমাজ পড়বে না তারা— বেশিরভাগ গ্রামবাসী সেকথা মেনে নেয়। এই যুবকদল ময়নাকে ঢাকায় নিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়। কাহিনীতে এই অংশে বাংলাদেশের জাগ্রত মানবিক বিচার বোধের পরিচয় পাই। তবে ঢাকায় 'ইহুদি নাছারা'দের 'ডলারে' তৈরি হাসপাতালে গর্ভপাত করানো হয় না— মৌলবাদীদের পাহারায় নয়— ময়নার জেদে। সে প্রসঙ্গে আসব পরে। 'ফরিদ স্যার' ছাড়া এই প্রগতিপন্থীদের নাম নেই। বাস্তবে এইসব সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর বাংলাদেশে অবদমিত।

তৃতীয় কণ্ঠস্বরটি বাংলাদেশে আলোচনায় বেশি আসে না। কিন্তু এই উপন্যাসে অতি সামান্য পরিসরে সেই কথাটি এনেছেন লেখক। ময়নার বারো বছরের প্রিয় ভাই ইনেছ। দিদিকে সে খুবই ভালোবাসে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একদিন 'ব্যাকরণ' বলতে বলেছিল 'ব্যাকারণ'। ময়না তাকে সংশোধন করে দেয়! শুদ্ধ কথা শেখার মধ্যে যে একটি আনন্দ আছে, তা বোঝা যায়— ইনেছ বলে ঃ 'তোমার কতা সুইন্যা আমার ভাল লাগতে আছে। (৯৫ পৃ.)'। শুদ্ধ বাংলা— মান্যবাংলা— কলকাতা শহরের আশপাশের বাংলা। মান্য চলিত— Lingua franca, সেই ভাষা যথাযথ আয়ত্ত করা ময়নার স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সে সঞ্চারিত করে তার ছোট ভাইটির মধ্যে। বলে 'ইনেছ, তোকেও এভাবে কথা বলতে হবে, তোকে অনেক লেখাপড়া শিখতে হবে, অনেক বই পড়তে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে, আমিও অনেক বই পড়বো, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবো।' (৯৫ পৃ.)। এই স্বপ্ন— একটি কিশোরী মেয়ের নয় শুধু— বাংলাদেশের অনেক মেয়েই এই স্বপ্ন দেখে থাকে। তবে সম্ভবত ময়নার মতোই অবরুদ্ধ বেদনার মুহ্যমান হওয়া ছাড়া কোনও গতিই তাদের থাকে না। দিদি যেখানে ধর্ষিতা হয়, সেখানে গিয়ে দিদির পুঁতির মালার অবশেষ, ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরো, নরপশুদের সিগারেট, লাইটার খুঁজে পায় ইনেছ। তার ইচ্ছা— এগুলো সে চিরকাল সযত্নে রক্ষা করবে। তার মনে জেগে ওঠে প্রতিহিংসা— 'আমি অইগুলিরে খুন করুম, একদিন খুন করুমই।' (২৩ পৃ.)। যার প্রিয়তমা দিদিকে নষ্ট করেছে চার চারটি পশু তাদের হত্যা করার ইচ্ছা আসলে পরের প্রজন্মের ইচ্ছায় পর্যবসিত করতে চান হুমায়ুন। ভাষা ছাড়া— শুদ্ধ ভাষা সংস্কৃতি ছাড়া সেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আসল উপায় তো নেই। উপন্যাসের বর্ণনায় বার বার পানি-র বদলে এসেছে জল। ময়না তার মাকে আম্মা বলে না— মা বলে ডেকেছে;বাবাকে আব্বা বলেনি। জব্বরও মেয়েকে বার বার ভেবেছে 'লক্ষ্মী'। এসবই এক ভাষা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের ইতিবাচক এই ফলকে ভুলে গেলে বাংলাদেশ হয়ে পড়বে মিথ্যা— পাকিস্তানের একটি টুকরো, তার বাইরে আর কোনও অস্তিত্বই থাকবে না। হুমায়ুন আজাদ সেকথা জানেন বলেই এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরটি যোজনা করেছেন। উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে রহস্যময়— তাৎক্ষণিক ঘটনার চেয়ে জাতি রাষ্ট্রের দূর ভবিষ্যতের প্রাণিত এই উচ্চারণ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে বর্তমান লেখায়। খুব স্পষ্ট হয়নি— সেটাই লেখকের কাম্য ছিল সম্ভবত।

রহিমা ময়নার প্রিয় সখি। ময়না গর্ভবতী হবার পর একদিন রহিমার কাছে গেছে। তীব্র অপমানিত হয়েছে। রহিমার মা আর চাচী তাকে যা ইচ্ছা তাই বলেছে। ময়না অবশ্য কিছুই বলেনি। শান্তভাবে ফিরে এসেছে। সেই রাত্রে রহিমা আত্মহত্যা করেছে! প্রাণোচ্ছল মেয়ে, সখির অপমানকে নিজের অপমান

(এরপর ৯ পাতায়)

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন

নবকুমার ভট্টাচার্য

অর্থনৈতিক বিষয়টাই বেশ জটিল ও গোলমেলে যার কোনও ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক পরম্পরার গণ্ডিতে মেলা দুষ্কর। আজ কয়েক দশক হলো সারা পৃথিবী জুড়ে একটা ওলট-পালট চলেছে। বাজারকেন্দ্রিক খোলামেলা ব্যবস্থা, টেকনোলজির অভূতপূর্ব উন্নতি মানব সভ্যতার এক নতুন স্তরের সূচনা করেছে। কিন্তু এটাই একমাত্র ছবি নয়। পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে অনেক গভীর সমস্যা। অথচ তথ্য প্রযুক্তি, বিজ্ঞানের জয়গান আর মার্কেট ইকনমির আকর্ষণে চাপা পড়ে যাচ্ছে সঙ্কটের ছবিটা।

হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট থেকে যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে তা হলো বিশ্বে আজ যা খাদ্যসম্ভার রয়েছে ও বার্ষিক উৎপাদন হচ্ছে তাতে পৃথিবীর সব মানুষের পেট ভরে খেতে পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তব হলো— সমগ্র বিশ্বে প্রায় ৮০ কোটি লোক ক্ষুধার্ত। কেবল নিউইয়র্ক শহরেই প্রায় তিন লক্ষ মানুষ গৃহহীন-খাদ্যহীন। সভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বনজঙ্গল, চাষের জমি, পুকুর সবই নিঙড়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় শেষের পথে। কত সবুজ অরণ্য হারিয়ে গেছে শিল্পায়নের স্রোতে। চোখের সামনেই সিঙ্গুরের মতো তিন ফসলী উর্বর জমি হারিয়ে গেল। এর ফলে প্রকৃতিতে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। কোথাও ধূসর মরুভূমি আবার কোথাও অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা। বহু নদী আজ গতিপথ পরিবর্তন করে চলেছে। একে রোধ করা বিজ্ঞানের পক্ষে অসাধ্য। আজ শিল্পায়নভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির জন্য মানুষকে মূল্য দিতে হচ্ছে। এই অবস্থা কেন?

উন্নয়নের সোপান হলো শিল্পায়ন। নতুন নতুন শহর, বাজার তৈরি ও নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠলে তবেই উন্নতি হবে। আধুনিক শহর, বিশাল অট্টালিকা, শপিংমল ও সুদীর্ঘ হাইওয়ে এবং বড় বড় শিল্পস্থাপন আজ উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা। কিন্তু উন্নয়ন মানেই কি গ্রামকে শহর বানিয়ে ফেলা? চাষবাস তাহলে হবে কোথায়? মানুষ খাবে কী? এমনিতেই আজ পরিতৃপ্ত স্বয়ম্ভর সেই গ্রামবাংলা নেই। জমি অধিগ্রহণের কোপ পড়ছে চাষির মাথায়। পশ্চিমবাংলায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমে চলেছে। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৪.০৭ শতাংশ। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১.৩৬ শতাংশে। ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত এই অবস্থা একই রয়েছে। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই চার বছরে মোট চাষযোগ্য জমি কমেছে ৬ লক্ষাধিক হেক্টর। ১৯৮৬ সালে নিট কর্ষিত জমির মোট পরিমাণ ছিল ৫৪.৬৭ হেক্টর। হ্রাস পেয়ে ওই জমি ২০০১ সালে ৫৪.৪৩ হেক্টরে নেমে আসে। উর্বর কৃষিজমিতে শিল্পায়ন ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্কট ডেকে আনবে। রাজ্য সরকারের ২০০৬-০৭ সালের আর্থিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ওই বছরে এরাজ্যের ৮৬৮৭ হেক্টর জমির মধ্যে নথিভুক্ত অরণ্য ১৩.৮ শতাংশ, তবু চাষ হয়েছে মাত্র ৬১.৬৭ হেক্টর জমিতে। অর্থাৎ শিল্পায়নের জন্য যে হারে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে তাতে আগামীদিনে চাষের জন্য পশ্চিমবঙ্গে খুব সামান্য জমি পড়ে থাকবে। অথচ বাজার অর্থনীতির তত্ত্বলোচনায় কৃষি নির্ভর উন্নয়নের কোনও পথের নির্দেশ নেই। এখানে শিল্পায়নই নাকি একমাত্র উন্নয়নের পথ। যদিও শিল্পায়নের পথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বও আজকের পৃথিবীতে খুব একটা কার্যকরী হচ্ছে না। বড় বড় কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য শ্রমদপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে এরাজ্যে শিল্পের মন্দদশার জন্য ধর্মঘটের তুলনায় লকআউটই বেশি দায়ী। রাজ্যসরকারের ২০০৯ সালের রিপোর্ট বলছে ২০০২ সাল থেকে ২০০৯ সাল অবধি প্রতিবছর ধর্মঘটের সংখ্যাটা থেকেছে ৯ থেকে ৩২ এর মধ্যে। এরমধ্যে ২০০৩ সালে সবচেয়ে বেশি ধর্মঘট হয়েছিল, যার সংখ্যাটা ছিল ৩২। আর ২০০৬ সালে সবচেয়ে কম সংখ্যায় ধর্মঘট হয়েছিল। সেবারের অঙ্কটা ছিল ৯। এদিকে দেখা যাচ্ছে লকআউটের সংখ্যা ছিল ২০০৮ সালে সবচেয়ে কম। যদিও লকআউটের সংখ্যা ছিল ২০০৮ সালে ২৬০। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লকআউট হয়েছিল ২০০৫ সালে— ৩৫৭টি। লকআউটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে ২০০৯ সালে, যার সংখ্যাটা হলো ১৫.২৫ মিলিয়ন শ্রমদিবস। আর লকআউটের জন্য সবচেয়ে বেশি শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে ২০০৩ সালে— ২৪.৮১ মিলিয়ন শ্রম দিবস। সংঘটিত শিল্প আজ বাড়ছে না বরং কমছে।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট ও লকআউটের খতিয়ান

সাল	ধর্মঘটের সংখ্যা	ধর্মঘটের জন্য শ্রমদিবস (সংখ্যা মিলিয়নে)	লকআউটের সংখ্যা	লকআউটের জন্য শ্রমদিবস নষ্ট (সংখ্যা মিলিয়নে)
২০০২	৩০	১.১৯	৩৪৬	২০.৬৮
২০০৩	৩২	১.৫৫	৩৫১	২৪.৮১
২০০৪	২০	১.৬৬	৩৫৪	২৪.৩৮
২০০৫	২৬	৩.১১	৩৫৭	২২.৩৩
২০০৬	৯	.২৪	২৬৫	১৮.৭৫
২০০৭	১১	১৩.৩৫	২৭৬	১৭.১৪
২০০৮	১২	৩.৮০	২৬০	১৫.৭০
২০০৯	১০	৩.৯৬	২৬৩	১৫.২৫

পাশাপাশি খুব দ্রুত গতিতে পরিষেবামূলক কাজকর্মের জগৎ ফুলে ফেঁপে উঠছে। নিত্য নতুন পরিষেবা পণ্য বাজারে প্রবেশ করছে। এর সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ক্রেডিট ইকনমি। মহাজন তার নিজের স্বার্থেই বিক্রেতাকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখছেন আরও ঋণ দিয়ে। ক্রেডিট ইকনমি তাই বেড়েই চলেছে। যতদিন না আপনা থেকে ভেঙে পড়বে ততদিন একে থামানো সম্ভব নয়। থামালেই সর্বনাশ।

বিশ্বায়নের বাজারে আজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান ব্যবসা হলো মাদক দ্রব্যের বেআইনি কারবার। এই ব্যবসার পরিমাণ এখন প্রায় বার্ষিক ৮০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। বিশ্বের কোনও আইনি ব্যবস্থাই একে বন্ধ করতে পারছে না। এছাড়াও বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রসারের প্রয়োজনে একদিকে একদল মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে হচ্ছে, অন্যদিকে আর্থিক সম্পদ ও ভোগের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকছে অল্প কিছু ধনী মানুষের হাতে। অর্থনীতিবিদদের একটা অংশ অনেকদিন ধরেই এব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু বিশ্বায়ন, উদারীকরণের রমরমা প্রচারে তা চাপা পড়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন উদারীকরণের অগ্রগতি ও মার্কেট ইকনমির প্রসারে এক নতুন দিকের ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এর ফলাফল কোনও দিকে মোড় নেবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেশের অবকাশ রয়েছে।

তবে নানা বিভ্রান্তির মধ্যেও আমাদের সৃষ্টিশীল ঐতিহ্য এবং জনজীবনের স্মরণীয় কীর্তি ও পরম্পরাকে রক্ষা করে চলেছেন অনেক মানুষ। জীবন এবং আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত পরম্পরাকে তাঁরা বিবেকহীন মুনাফার পণ্যে পরিণত করেননি।

একটি উপন্যাসের বহুস্বর

(৮ পাতার পর)

ভেবে নিয়েছে। তার আত্মহত্যা— বাংলাদেশের নারী দ্বেষী একমাত্রিক ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অসহায় এক নারীর প্রতিবাদ ছাড়া অন্য কোনও ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

রহিমা-ফুলি-ময়না-ফুজু-রা ওয়াজ শুনতে শুনতে বাংলাদেশের নারীদের একটি অন্যভাষ্য তৈরি করছিল। তারা প্রশ্ন তুলছিল— সৌদি আরব, আবু ধাবিতে ধনাঢ্য আরবীদের নোংরা পরিষ্কার করে তরুণ বাংলাদেশীরা যে জীবন কাটাচ্ছে তা তো সম্মানের জীবন নয়। আরও ভেবেছিল তারা হিন্দু মেয়েদের উপর অত্যাচারেরও প্রতিবাদ হওয়া উচিত। 'গোয়ালবারির অন্নপুণ্যা' 'জাউল্যাবাড়ির সীতা'-দের ধর্ষণ ও হত্যার তারা সমালোচক। তাদের বাড়ির মানুষজন বাংলাদেশ আর নিরাপদ নয় ভেবে চলে এসেছে। প্রশ্নটি বার বার উঠে এসেছে। কখনও ময়নার ভাবনায়, কখনও জববরের চেতনায়। আর এর মধ্যে দিয়ে যে বহুধর্মের সহনশীলতার ঐতিহ্য— ভারতীয় উপমাহাদেশের প্রকৃত সত্য-চিত্রটি মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে ওঠে এই উপন্যাসে। জানা যায়, 'ইন্দুরা এইবার পুজা করে নাই।' গুন্ডারা দুর্গামূর্তি ভেঙে ফেলেছে— শাসিয়ে গেছে 'আবর মূর্তি বানাইলে দ্যাশছারা করব।' (১১৩ পৃ.)। অথচ জববর বলে ঃ কেদার পুর এমন ছিল না। 'পুজায় যাইয়া এক সোম আমরা কত আনন্দ করতাম।' আমাগো ছোডব্যালায় কত নাচগান অইত, যাত্রা অইত, ছারকাছ অইত।' (১১৩ পৃ.)। বাংলাদেশ দিনকে দিন সেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের রূপটিকে ছেঁটে ফেলে একমাত্রিক হয়ে পড়ছে। এই সংবাদ, উপন্যাসের মুখ্য বাস্তব নয়— তবে উপেক্ষা করার মতো নয়।

ময়না কারো কথা শোনে না। তার শরীরে বেড়ে ওঠা শিশুটিকে ঘৃণা করে। অথচ বাঁচিয়ে রাখে। গর্ভপাত করে পরতিশোধ নেওয়া হবে না তার। শেষে যখন তার পুরুষ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় ঃ '...একটি শিশ্নধারী বাচ্চা জন্ম নিয়ে পৃথিবীর সাথে প্রথম সংঘর্ষে আর্তচিৎকার করে ওঠে।' (১২৮ পৃ.)। ময়না তাকে হত্যা করে। তার হাতে দীর্ঘদিন ধরে ধার দেওয়া কাটারিটি ঝলমল করে। আসলে এভাবেই ময়না তার বিরুদ্ধে ঘটা মৌলবাদীদের আক্রমণের জবাব দেয়। আসলে তার এই একক প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ায় জেগে ওঠে একটি দৈবী সত্তা। মনে হয় সেই অসুরদলনী অস্ত্রধারিনী জননীর ভয়ঙ্কর এক রূপ, সাহিত্য-সমালোচকের ভাষায় বলা যায় আদি কল্প বা archetype এখানে মূর্ত হয় যেন। একটু উল্লেখ করছি ঃ '...পাট পাতার সবুজে সে সবুজ হয়ে গেছে, বিকেলের রোদের সোনায় সে সোনা হয়ে গেছে, তার দাটি ঝকঝক করছে সবুজে সোনায়; সে দেগে চারদিক থেকে দাঁত উঁচিয়ে আসছে শুয়োরগুলো, সে তাদের দেখে ভয় পাচ্ছে না, সে একেকটিকে কোপাচ্ছে দা দিয়ে,...।' (৯২ পৃ.)। বাংলাদেশের সবুজ পতকা— সোনালী মানচিত্র আর সূর্যের আভাসে ভাস্বর এই আদিকল্পটি উপন্যাসে চমৎকার ফুটে ওঠে। শেষে অবশ্য আবার গণধর্ষিতা হয় ময়না। থানায়, লকআপে— পুরুষ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক নারীর বিদ্রোহকে দমন করে হয়ত এভাবেই। বিচার সভায় প্রকাশ্যে ময়না সেসব কথা বলে। ময়না বুঝতে পারে 'কারাগারে যে-শুয়োররা দিনে ও রাতে আসে তার কাছে, তারা পাটখেতের শুয়োরদের থেকেও জঘন্য।' (১৩১ পৃ.)। তার অনুভবে দেশটাই জারজে ছেয়ে গেছে —বিচারককে তার প্রকাশ্যে ডাক, 'আহেন, আপনেও আমারে ধর্ষণ করেন।' (১৩২ পৃ.)। সমস্ত পুরুষ শাসক-প্রশাসক-অধ্যাপক-উপাচার্য-মন্ত্রী-বিচারক ও শান্তিরক্ষকদের কাছে তার আহ্বান ঃ 'আহেন...।' গোটা একটা দেশ, একমাত্রিক ধ্যান ধারনায়, বিকৃতিতে, ধর্মের নামে অত্যাচারে, সংখ্যাল্পদের জান-মান-সম্পদ লুণ্ঠনে যখন অপরাধের পর অপরাধ করে তখন সেই দেশের এক ধর্ষিতা মানবীকে দেশের প্রকৃত লাঞ্ছিত অসহায় বিবেক বলেই মনে হয়। শেষে জানাই হুমায়ুন আজাদের বিবেকী কলমটি স্তব্ধ হয়েছে। জার্মানীতে এক আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন, ফেরেননি। তাঁর মৃত্যুর রহস্য কোনওদিন উন্মোচিত হবে বলে মনে হয় না।

আলোচিত বই ঃ '১০,০০০, এবং আরও ১টি ধর্ষণ' ঃ হুমায়ুন আজাদ;আগামী প্রকাশনী; প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩; আমরা দেখলাম চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০০৯। ১৬০ টাকা।

চিঠিপত্র

মহারানা প্রতাপ সিংহ

পি. কে. ঘোষ পরিবেশিত তথ্যের অনুবৃত্তিক্রমে অপর একটি তথ্য উল্লেখ করছি। তা হলো, হলদিঘাটের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর রানা প্রতাপ তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিরামহীন লড়াই চালিয়ে আজমীড়, চিতোর এবং মণ্ডলগড় ব্যতীত সমগ্র মেবার আকবরের মোগল বাহিনীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ("...before his death, all Mewar except Ajmer, Chitor and Mandalgorh was in his hands."–'The History and culture of the Indian Perple'–Vol-VII–R.C. Majumder)। তথ্যটি উল্লেখ করার কারণ, "ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক" বলে বিজ্ঞাপিত দৈনিকের প্রতিবেদক যেমন হলদিঘাটের যুদ্ধে মোগলদের হাতে রানা প্রতাপের নিহত হওয়ার 'অলীক' ধারণা পোষণ করেন, তেমনি আমরাও যেন এমন ধারণা করে না থাকি যে, হলদিঘাটের যুদ্ধের পর রানা প্রতাপ মোগল সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে তাঁর বাকি জীবনকাল পাহাড়ে-জঙ্গলে পালিয়ে থেকেছেন।

পরিশেষে, আর একটি কথা। রানা প্রতাপের মৃত্যুর কারণ ও তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন—"It is related that one day while hunting, the Mohorana struck his own bow and was wounded. This wound proved to be fatal, and he died on 11 Magh Shukla, 1663 V.S. (29 January, 1597), at the age of fifty-eight"। উল্লেখ্য, গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী রানা প্রতাপের মৃত্যুর তারিখ ১৯ জানুয়ারি না বলে ২৯ জানুয়ারি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা।

কংগ্রেসের দুর্নীতি

শতাধিক বছরের পুরানো ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তথা সোনিয়া গান্ধীর কংগ্রেস আজ দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। একটি বছরের মাত্র কয়েক মাসে চার-চারটি প্রকাশিত দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে এই দল। সেই আই পি এল থেকে শুরু আর আপাতত টু জি স্পেকট্রাম দুর্নীতিতে শেষ। আপাতত বলা হচ্ছে এই কারণে যে অতঃপর আরও দুর্নীতি ফাঁস হতে পারে। কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা এত দুর্নীতি-কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে রয়েছেন যে প্রায় প্রতিদিনই কারু না কারু দুর্নীতি ফাঁস হচ্ছে। আই পি এল-এর আর্থিক দুর্নীতির দায়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শশী থারুরকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। কারণ তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাঁর প্রেমিকা (বর্তমানে স্ত্রী)-কে অনৈতিকভাবে প্রায় ৭০ কোটি টাকা পাইয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার কয়েকমাস পরে আসে কমনওয়েলথ গেমস। আর সেই গেমসের জন্য বরাদ্দ টাকায় চলে 'হরির লুট'। কমনওয়েলথ গেমস কমিটির প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস এম পি সুরেশ কালমাদি অ্যান্ড কোম্পানী ওই টাকায় মেরেছেন বেশ ভালো রকমের দাঁও। আর এই দাঁও মারার কোম্পানীতে রয়েছেন বহু কংগ্রেসি নেতা-মন্ত্রী, আমলা ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর দিকেও রয়েছে অভিযোগের তীর। এহেন আর্থিক দুর্নীতি ও তহবিল তছরূপের খবর প্রকাশ পেয়েছে 'ক্যাগ' ও সরকারি তদন্ত সংস্থার রিপোর্টে। এঁদের অনেকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও দায়ের হয়েছে। শুরু হয়েছে সিবিআই তদন্তও। তবে কালমাদির 'গর্দান' গেলেও শীলা দীক্ষিত ও ক্রীড়ামন্ত্রী গিলের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। কারণ তাঁরা ম্যাডাম সোনিয়ার লোক।

এদিকে কমনওয়েলথ গেমসের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে দেশব্যাপী হইচই-এর রেশ কাটতে না কাটতেই ফাঁস হয়েছে মুম্বইয়ের 'আদর্শ হাউজিং সোসাইটি'র কেলেঙ্কারি। সেনাবাহিনীর জমিতে গড়ে ওঠা এটি একটি ৩১ তলা বহুতল। এর ১০৪টি ফ্ল্যাট কারগিল যুদ্ধে শহিদদের পরিবারগুলিকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যবন কয়েকটি ফ্ল্যাট অনৈতিকভাবে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পাইয়ে দিয়েছেন। তবে অনেক টালবাহানার পর সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশে ইউপিএ (কংগ্রেস) সরকার অশোককে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে দেন সরিয়ে। এই ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদমাধ্যম বোমা ফাটায় টু জি স্পেকট্রাম বা টেলিকম কেলেঙ্কারি নিয়ে। ভারতে সর্বকালের বৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি এটি। ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা নয়-ছয়ের কেলেঙ্কারি বা দুর্নীতি। আর এই কেলেঙ্কারির যিনি নায়ক তিনি কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী এ. রাজা। এই গুণধরটি আবার করুণানিধির ডি এম কে দলের এম পি। চাপের মুখে পড়ে ইনি সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, তিনি যা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে জানিয়েই করেছেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী এর দায় এড়াতে পারেন না। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও বিরোধীদের অনুমান এতবড় আর্থিক কেলেঙ্কারির পাণ্ডা একা রাজা নন, এর সঙ্গে আরও অনেক রাঘববোয়ালও আছে জড়িত। অনেকেই এই লুটপাটের অর্থ পেয়েছেন। 'ক্যাগ'-এর তদন্তে আর্থিক দুর্নীতি ধরা পড়েছে। সি বি আই তদন্তও শুরু হয়েছে। সঠিক তদন্ত হলে বহু দুর্নীতিবাজের মুখ আমরা দেখতে পাব। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা উঠেছে। এক্ষেত্রেও অনেক নাটক, হুমকি, তর্জন-গর্জনের পর চাপের মুখে অবস্থা বেগতিক বুঝে এ রাজা অবশ্য পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। একজন বিরোধী রাজনীতিক রসিকতা করে বলেছেন, কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলির পদাধিকারি ও মন্ত্রীদের দুর্নীতির দায়ে যেভাবে পদ থেকে তাড়ানো হচ্ছে তাতে 'ঠক বাছতে না গাঁ উজার' হয়ে যায়! পরিস্থিতি কিন্তু সেদিকেই যাচ্ছে।

কংগ্রেসের দুর্নীতি নতুন কিছু নয়। নেহরুর রাজত্বে জিপ কেলেঙ্কারি দিয়ে শুরু। রাজীব গান্ধীর আমলে ৬৪ কোটি টাকার 'বোফর্স' কেলেঙ্কারি সারাদেশ জুড়ে হইচই ফেলেছিল। কমিশনের টাকা হাতিয়েছিল সোনিয়ার আত্মীয় কাত্রোচ্চি। সন্দেহের আঙুল উঠেছে নেহরু-গান্ধী পরিবারের দিকে। তবে সম্প্রতি সোনিয়া-রাহুল আর এস এস-কে সন্ত্রাসবাদী দল বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কংগ্রেসিদের দুর্নীতিতে তাঁদের মুখে রা নেই কেন? কেন তাঁরা চুপসে গেছেন? সন্দেহটা এখানেই। তবে কী তাঁরাও সব জানেন? তাই কী তাঁদের এই দুর্দশা—"ফান্দে পাড়িয়া বগা কান্দেরে!"

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

হিন্দু কবে জাগবে

মুসলিমদের দ্বারা হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন। আমরা হিন্দুস্থানে বাস করেও মুসলমানের হাতে মার খাচ্ছি, এভাবে আর কতদিন নীরবে সহ্য করব? আমরা কি জেগে উঠব না? কাল ঘুম কি আমাদের ভাঙবে না? পূর্ব বাংলা থেকে আমরা অত্যাচারিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই নিয়েছি। এখানেও রাজনৈতিক দলগুলোর মদতপুষ্ট উগ্রপন্থী মুসলমানরা সমবেত ভাবে আমাদের মন্দির, মঠ ধ্বংস করছে। বরযাত্রীর গাড়ী থামিয়ে মেয়েদের মসজিদে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করছে। এতেও কি আমাদের চৈতন্য হবে না?

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম প্রধান জায়গাগুলোতে হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন।

সাম্প্রতিক কালে দেগঙ্গায় ঘটে যাওয়া ঘটনা স্বস্তিকা পত্রিকা ছাড়া অন্য কোনও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

হিন্দু জাতি, বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুরা আত্মবিস্মৃত জাতি। তাঁরা ভুলে গেছে ১৯৪৬ সালের ঘটনা, ভুলে গেছে স্বাধীনতার নামে দেশকে তিন টুকরো করার পরের ঘটনা সমূহ!

এখনও সময় আছে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সমস্ত হিন্দু জাতির একত্রিত হওয়া, তাই স্বামী প্রণবানন্দ বলেছিলেন, "হিন্দু রক্ষীদল" পাড়ায় পাড়ায় গঠন করার কথা। কোনও হিন্দুর ঘরে আত্মরক্ষার জন্য একটি লাঠিও পাওয়া যাবে না। অপরদিকে মুসলমানরা আধুনিক অস্ত্রশাস্ত্রে সজ্জিত। তারা দলবদ্ধ ভাবে সমস্ত মতভেদ ভুলে হিন্দুদের আক্রমণ করেন। তখন আমরা বৈষ্ণবীয় ভাবে ভাবিত হয়ে নিরস্ত্র হয়ে বসে মালা জপি, যখন আক্রান্ত হই তখন মালা, ঠাকুর ফেলে পালিয়ে জীবন বাঁচাই।

হিন্দু মন্দির যখন আক্রান্ত হয় তখন অন্য মন্দিরের পূজারীগণ দূর থেকে মজা দেখেন। কোনও হিন্দু বাড়ী আক্রান্ত হলেও পাশের বাড়ীর লোকজন মজা দেখেন, তাঁরা হিন্দুদেরই দোষ খুঁজে বেড়ান।

হিন্দুরা রাজনৈতিক ভাবে বহু বিভক্ত ধর্মীয় ভাবেও শত বিভক্ত। এইসব মত-পথ ভেদাভেদ ভুলে সকল হিন্দুদের সমবেত ভাবে তার প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসা উচিৎ।

—অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, দেবী বাড়ী, নতুন পাড়া, কোচবিহার।

স্বস্তিকা 'দৈনিক' নয় কেন?

বর্তমান ভারতের ভাগ্যাকাশে ক্ষমতালিপ্সার অশনিসংকেত। সাংবিধানিক মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্লজ্জ মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতা। কেউ পদবী বিসর্জন দিয়ে 'বেগম' সাজছেন, আবার কোনও 'রায় সাহেব' কাশ্মীরকে স্বাধীনতা দানের পক্ষে সওয়াল করছেন। দেগঙ্গায় হিন্দু নির্যাতন হলেও বুদ্ধি জীবীগণ (পড়ুন দুর্বুদ্ধি জীবীগণ) চুপচাপ থাকেন। প্রতিমা ভাঙচুরের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা দেখেন, কেউ এর প্রতিবাদ করলে তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেন। এরা রিজওয়ানুরের মৃত্যুতে চোখের জলে বুক ভাসান কিন্তু কোনও হিন্দু ছেলে, মেয়ে লাঞ্ছিত হলে মুখ বুজে মজা দেখেন। দেগঙ্গার হিন্দু নির্যাতন কোনও পত্রিকায় স্থান পায় না। আধুনিক ভারতের 'যোগেন মণ্ডল', দৈনিক স্টেটসম্যানের সুকুমার মিত্রের মতো হলুদ সাংবাদিক দেগঙ্গায় কোনও অন্যায় দেখতে পান না। এরা গিলানীকে দিয়ে ভারত বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ান, ইমামদের রাজার হালে রাখেন, হজ পালনের জন্য কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দেন, মাদ্রাসার নামের আড়ালে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপনে উৎসাহ দেন, মুসলিমদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন। কিন্তু কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান দূরের কথা—তীর্থ করের নামে 'জিজিয়া কর' আদায় করেন। এই প্রসঙ্গে কেউ কোনও কথা বললে তাকে সাম্প্রদায়িক তকমা দেওয়া হয়।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের অর্থ বর্তমান রাজনীতিকদের নিকট হিন্দু বিরোধিতা করা ও মুসলিম তোষণ করা। মুসলিম উগ্রবাদীদের তোল্লা দিতে গিয়ে গান্ধী ভারত ভাগ ডেকে এনেছিলেন। বর্তমান কংগ্রেসী ও বামপন্থী রাজনীতিকগণ যেভাবে নির্লজ্জ মুসলিম তোষণে কোমরে গামছা বেঁধে আঁচল বেঁধে নেমে পড়েছেন তাতে ভয় হয় নতুন করে আবার ভারতভাগ এগিয়ে আসে কি-না।

নির্বীর্য সরকার জঙ্গি কাসবের বিরুদ্ধে প্রমাণ খুঁজে পান না, তাকে রাজার হালে রাখেন আবার তার থুতুও চাটেন। কিন্তু কোনও সংবাদপত্রে তা গুরুত্ব পায় না। হিন্দুর মেয়েকে কোনও মুসলিম জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গেলে তা খবর হয় না—যেন এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনও হিন্দু পিতা যদি এর প্রতিকার চায় তবে কংগ্রেসী-বামপন্থী ও দুর্বুদ্ধি জীবিরা রে রে করে তেড়ে আসে। বাজারী পত্রিকাই হোক আর ইংরেজী নামের বাংলা পত্রিকাই হোক—এদের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ সত্য ঘটনা প্রকাশ পাওয়া দুরাশামাত্র। একমাত্র সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' তার দুঃসাহস নিয়ে সত্য ঘটনা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে।

এমতাবস্থায় স্বস্তিকা কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত নিবেদন জানাই যে, আপনারা জাতীয়তাবাদী সমাজ-শক্তিকে সত্য ঘটনা প্রতিদিন জানানোর ব্যবস্থা নিন। অসৎ রাজনীতিকদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করুন। হিংসার বিরুদ্ধে, দাঙ্গার বিরুদ্ধে সবাইকে একত্রিত করুন। দৈনিক স্বস্তিকা প্রকাশ করুন। আমরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি যেন আগামী পয়লা বৈশাখের মধ্যে দৈনিক স্বস্তিকা পাঠকের হাতে হাতে পৌঁছায়।

—অপরাজিতা দেবনাথ, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

ও বি সি—মুসলিম সংরক্ষণ

মুসলিম তোষণের আরও একটি নমুনা রাখল রাজ্য সরকার। সরকারি চাকরিতে ১০ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সেকথাই প্রমাণ করে। এছাড়াও কিছু মুসলিম সম্প্রদায়কে ও বি সি তালিকাভুক্ত করার ঘটনা মুসলিম প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার এব্যাপারে দরখাস্ত নেওয়া এবং ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ একই সঙ্গে করার সিদ্ধান্ত তো মুসলিম স্বার্থ রক্ষার অন্যতম পন্থা। অর্থাৎ রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টকে মুসলিম তোয়াজের একটা হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

তবে শুধু এ রাজ্যে নয় অন্যান্য রাজ্যেও মুসলিম সংরক্ষণের ঘটনা হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে আতঙ্কিত হবার মতোই একটা বিষয়। এ ঘটনা দেশের স্বার্থেও একটা অশনি সংকেত হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। অর্থাৎ সরকারি বিভিন্ন পদে মুসলিমদের আধিক্য ঘটলে মুসলিমরাই এদেশে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিলে তা কি দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে?

সমাজের কোনও শ্রেণী অন্যদের চাইতে অনগ্রসর বা অনুন্নত হলে তাদের জন্য বিশেষ কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মুসলমানরা কি সত্যিই আর্থিক অনগ্রসরতার আওতায় আসে? তবু মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক নেতৃকুলের তৎপরতা বহুলাংশে ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তাদের জন্য যেন কল্পতরু সাজবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে এরাজ্যে নেতা-নেত্রীদের মধ্যে। এ সবই তো আসন্ন বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষণ। এহেন ঘটনায় কি সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পায় না? অথচ হিন্দু স্বার্থ নিয়ে যে কোনও পদক্ষেপেই সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান এই তথাকথিত নেতা নেত্রীরা। হিন্দু স্বার্থে প্রভূত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এলাহাবাদ হাইকোর্টে রামমন্দির ইস্যুতে প্রায় ৬০ বছর পুরনো অযোধ্যা মামলার রায় দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হন বিচারপতিরা। পাছে মুসলিম স্বার্থে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায়। এটা কি সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষেই অবমাননাকর ব্যাপার নয়? আশ্চর্যের ব্যাপার যে মুসলিমদের থেকে হিন্দু রাজনৈতিক নেতানেত্রীরাই হিন্দু স্বার্থের বিরোধিতা করে থাকেন। এদের বিশ্বাসঘাতক বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই চাকরিতে মুসলিম সংরক্ষণের মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নেন।

তবে হিন্দুদের অসংগঠিত থাকার খেসারৎ ভবিষ্যতেও দিতে হবে। তাই আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ আর বিজেপির মতো জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সারা দেশে হিন্দুত্ববোধ জাগ্রত না হলে হিন্দুসমাজের অবস্থা খাদে পড়ে মরা হাতির মতো হতে বাধ্য।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলি।

আত্মিক ভোজন

চৈতালী চন্দ

আমরা জানি আমাদের শরীর পাঁচ তত্ত্ব দ্বারা তৈরি, যথা— ক্ষিতি (Earth), অপ (Water), তেজ (fire), মরুৎ (Ether), ব্যোম (Air)।

পৌষ্টিকতার দিক থেকে শরীর সাত উপাদান দ্বারা গঠিত— কার্বো-হাইড্রেটস্, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, রাফেজ এবং জল। কার্বো-হাইড্রেট শরীরকে দেয় উদ্যম বা Energy। প্রোটিন শরীরকে তৈরি করে (body building component)। ভিটামিন ও মিনারেল আমাদের শরীরকে রক্ষা করে (protective)। রাফেজ ও ওয়াটার পরিশোধনের কাজ করে (Cleans the body)। এই সাতটি উপাদানের যে কোনও একটি জিনিসের অভাব ঘটলে আসে রোগ। যেমন ভিটামিন 'এ'র অভাব দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটায়, ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ের রোগ আসে। রাফেজ ও ওয়াটারের অভাবে আসে কোষ্ঠকাঠিন্য ও প্রস্রাবের গোলমাল (Constipation and urinary Problem)।

আমাদের শরীর চালায় আত্মা। সেই শরীরকে চালানোর জন্য আত্মার ভিতরে আছে ৭টি গুণ, এজন্য আত্মাকে সতোগুণী বলা হয়। এই ৭টি গুণ হলো জ্ঞান, পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি, সুখ, আনন্দ ও শক্তি। এই ৭টি উপাদান শারীরিক উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

জ্ঞান ও পবিত্রতা ঃ জ্ঞান মানে আলো (Light)। জ্ঞান হলো ঐশ্বরিক জ্ঞান। এই জ্ঞান আত্মার এক উচ্চতম প্রধান আহার। আমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা না এলে এই জ্ঞান লাভ করার ইচ্ছা আসে না। আধ্যাত্মিকতা মানে অধ্যয়ন দ্বারা আত্ম- উন্নতি (Self Development)। আধ্যাত্মিকতা এলে প্রশ্ন আসবে "আমি কে"? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাবো? কে আমার আসল পিতা? এই জ্ঞান যখন আমি লাভ করব তখন আসবে আমার মধ্যে পবিত্রতা। কারণ ঐশ্বরিক জ্ঞান আমার বুদ্ধি, চিন্তা শক্তির উন্নতি করে। ফলে আমার কাজ কর্ম ও ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটে। ফলে অপবিত্রতার কোন স্থানই জীবনে থাকে না। জ্ঞানের বিষয় যখন আমরা মনন চিন্তন (Chew) করি তখন আসে আমাদের সক্রিয়তা অথবা উদ্যম (Energy)। পবিত্রতা হলো আত্মার সবচেয়ে বলশালী আহার। জ্ঞানের সম্পর্ক মস্তিষ্কের এই জ্ঞান না থাকলে আসে মানসিক অস্থিরতা (Mental Disturbance), নেতিবাচক চিন্তা, স্মরণশক্তি কমে যায়। পবিত্রতা আমাদের শরীরের ভিতর ও বাইরে এককথায় পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে। রোগপ্রতিরোধ করার শক্তি পবিত্রতা থেকেই আসে, পবিত্রতার লক্ষণ আমার চেহারায় ও চোখে ফুটে ওঠে। পবিত্রতার অভাব হলে আসে চর্মরোগ (Skin Disease)।

প্রেম ঃ জ্ঞান ও পবিত্রতা এলে আসে প্রেম, প্রেমের দ্বারা আমাদের হৃদয় ভালো কাজ করে। প্রেম কম হলে ক্রোধ বেশী আসে। Blood pressure high হয়, ফলে হৃদরোগের সম্ভাবনা আসে। যার মধ্যে প্রেমের গুণ আছে সে সর্বদা শান্ত থাকে।

শান্তি ঃ যখন জ্ঞান, পবিত্রতা ও প্রেম থাকে তখন আসে শান্তি। শান্তি আত্মার স্বধর্ম, তাই আমরা সর্বদা শান্তি চাই। প্রেমযুক্ত পবিত্র আত্মা শান্তিতে থাকে, তার কোনও অবসাদ থাকে না, দুঃখ থাকে না। শান্তি কাজ করে আমাদের ফুসফুসে, শান্তি শ্বাস-প্রশ্বাসকে সচল রাখে। এজন্যই দুঃখে আমরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি এবং আনন্দে আমরা শ্বাস নিই। শান্তির সঙ্গে শ্বাস নেওয়া মানে শরীরে শ্বপ্রস্তুফ্ন্দ্ধ ঢোকানো।

সুখ ঃ যখন জ্ঞান, পবিত্রতা, প্রেম ও শান্তি থাকে তখন আসে সুখ। সুখের সম্পর্ক পাকস্থলির সঙ্গে। খুশী বা সুখের দ্বারা স্নল্লন্দ্বক্ত কাজ করে। বলা হয় খুশী সবচেয়ে ভালো খোরাক। কোনও কিছু আমরা খুশী মনে না খেলে হজম হয় না। মানসিক রোগের ডাক্তাররা এজন্য বলেন মনের বাজনা পেটেই বাজে অর্থাৎ এক কথায় সুখ আমাদের হজম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

আনন্দ ঃ যখন জ্ঞান, পবিত্রতা, প্রেম শান্তি ও সুখ আসে তখন জীবনে আসে চরম আনন্দ। আনন্দ আমাদের হরমোনস, পিট্যু-ইটারী ও প্যাংক্রিয়াসকে ঠিক রাখে। এই আনন্দ কেবল সাংসারিক বৈভব থেকে আসে না। এটা অর্জনের জন্য উচ্চতম শক্তি ধারণ করতে হবে। এই শক্তি আসে ধ্যান থেকে। পরমানন্দের উৎস পরমাত্মা, তাই মন ও বুদ্ধিকে তার পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

শক্তি ঃ যখন জ্ঞান, পবিত্রতা, প্রেম শান্তি, সুখ ও আনন্দ এই সবকটি জিনিস আসে তখন আসে আত্মশক্তি (Wilforce)। এই শক্তি হলো আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি যার বলে আমরা বলীয়ান হতে পারি। তখন যে কোনও বড় কাজ আমাদের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়। আত্মিক বল প্রয়োগ করে আমরা যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি। নিজেকে সংসারের সব রকম রিপু বা বিকার থেকে মুক্ত রাখতে পারি।

আমরা দেহসর্বস্ব মানুষ ঃ শরীর ও আত্মাকে এক মনে করি ও শরীরকে সুন্দর বানানোর চেষ্টা করি। শরীর বিনাশী কিন্তু আত্মা অবিনাশী। শরীরের কথা চিন্তা করে তাকে ফল, মূল, ঔষধ ও নানাভাবে তাকে সজ্জিত রাখার চেষ্টা করি কিন্তু যে আত্মা আমাদের শরীরের চালক তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কথা আমাদের কখনই মনে আসে না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আত্মাই মূল। শরীর তো কেবল আত্মার বস্ত্র, আত্মা শরীর প্রাপ্ত হয় যাতে সে শ্রেষ্ঠ চিন্তন, সুকর্ম করে নিজের সেবা ও বিশ্বের সেবা করতে পারে। শরীরের উন্নতি সাধারণ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় কিন্তু আত্মার উন্নতি দেখতে গেলে তৃতীয় চক্ষু বা দিব্যনেত্র প্রয়োজন। ঈর্ষা ক্রোধরূপী ভোজন, পরনিন্দা, পরচর্চা, লোভ, মোহ, কাম আত্মাকে অপবিত্র করে। আত্মার সব থেকে প্রিয়ভোজন ঈশ্বর চিন্তন ও প্রার্থনা। তাই প্রতিদিন রাজযোগ বা Meditatio- এর অভ্যাস প্রয়োজন। রাজযোগের দ্বারাই আত্মা ৭টি শক্তিলাভ করে ও ৩৬টি দিব্য গুণ অর্জন করে। রাজযোগের মধ্য দিয়ে আসে সন্তুষ্টি। এই সন্তুষ্টি আনে জীবনে আনন্দ। ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আসে। ইতিবাচক ভাবনা আনতে কোনও অসুবিধা হয়না। এজন্য রাজযোগের মধ্যে দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে পরমধামে। চলতে ফিরতে বুদ্ধিতে রাখতে হবে আমি এক নিত্য শুদ্ধ আত্মা, আমি ঈশ্বরের এক প্রিয় সন্তান, এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে কেবল আমি কিছুদিনের জন্য অভিনয় করতে এসেছি। খালিচোখে আমি যা দেখেছি সবই বিনাশী, আজ যা আমার, কাল তা অন্যজনের; তবে কেন এই মোহ? এখানকার অভিনয় শেষ হলে আমি আবার ফিরে যাবো আমার পিতার কাছে পরমধামে। তিনি শিব, আমি শক্তি, তাঁর প্রেমের ছত্রছায়ায় সুরক্ষিত আমার শরীর। এখানে কিন্তু মন ও বুদ্ধি তাঁর সান্নিধ্যে।

প্রাচীন জটার দেউল

ডঃ প্রণব রায়

দক্ষিণ চবিবশ পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন এলাকায় একটি সু-উচ্চ ইঁটের দেউল 'জটার দেউল' নামে পরিচিত। ইঁটের এই দেউলটি উত্তর জটা গ্রামে অবস্থিত। এটি একটি সুপ্রাচীন দেউল। পশ্চিমবাংলায় প্রাক্-মুসলিম যুগের যতগুলি দেউল আছে, তার মধ্যে পশ্চিম জটার এই দেউলটি অন্যতম। আগের আলোচনায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমানে এই ধরনের দেউল লক্ষ্য করা গেছে। এগুলি 'শিখরমন্দির' বা 'শিখর' শৈলীর মন্দির।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

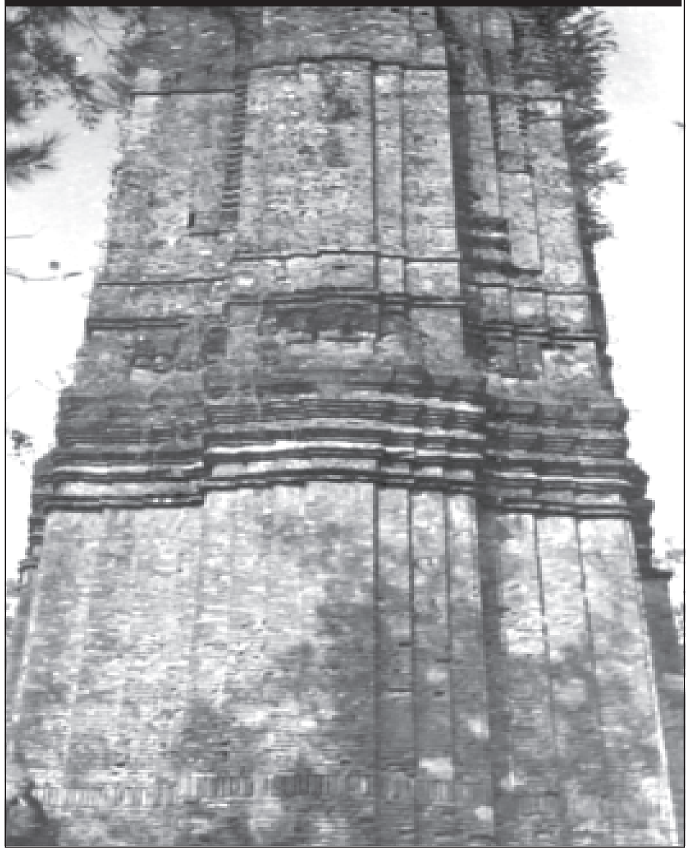

উত্তর জটার হিন্দু আমলের দেউল, মথুরাপুর, দঃ ২৪ পরগণা। প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তীকালে পূর্বোক্ত যে সব শৈলীর মন্দির তৈরি হয় হিন্দু আমলে বিশেষ করে, পাল-সেন যুগে এই 'শিখর' শৈলীর মন্দিরই ছিল প্রধান। বর্গ বা আয়তক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহের উপরিভাগে সুদৃশ্য ও অতি উচ্চ চূড়া বা 'শিখর' বসানো হোত সেযুগে যা খুবই দর্শনীয় ছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটিমাত্র প্রবেশপথ দিয়ে যাওয়া আসা হোত গর্ভগৃহে। সামনে দর্শককক্ষেরও অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। ভেতরে গর্ভগৃহের বেদিতে বিগ্রহ অধিষ্ঠিত হোত। সূর্য, বিষ্ণুনারায়ণ, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি সুকুমার ভাস্কর্যের দেববিগ্রহগুলি ওইসব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পাল-সেন যুগের 'শিখর' মন্দির প্রাচীন 'নাগর' শৈলীর মন্দিরের ক্রম বিবর্তিত রূপ। বাংলার নদী, মাটি, জলবায়ু ও পরিবেশে ওইসব মন্দির এক নতুন মাত্রা পায়। জটার দেউল তারই এক পরিণত রূপ।

এই মন্দিরটি এখন যে স্থানে অবস্থিত, সেটি আজও দুর্গম রয়ে গেছে। খৃস্টীয় দশম শতকের শেষ পাদে যখন এই মন্দির তৈরি হয়, তখন এই অঞ্চলে বেশ জনবসতি ছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রাচীন দীঘি, কঙ্কণদীঘির কয়েকটি ঢিবি, পাতলা ইঁটে তৈরি স্নানের ঘাট, মাটির নিচে ইঁটের দেওয়াল বা ভিত্তি— এইসব প্রমাণ করে, সেই প্রাচীনকালে এই অঞ্চল কতটা সমৃদ্ধ ছিল। কালক্রমে সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে দেউলটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

এই উচ্চ দেউলটির মাথা ভাঙা। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে স্মিথ নামে এক সাহেব এই দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করানোর সময় এই দেউলের উচ্চ শীর্ষটি ভেঙে দেন বলে জানা যায়। এখনও মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় একশ' ফুট। পলেস্তারা বিহীন ইঁটের এই দেউলটির গায়ে প্রাচীন 'রথ' বিন্যাস বা গভীর কাটা দাগ আছে। নিচের অংশের 'বান্ধকা'র ভাঁজ এখনও লক্ষ করা যায়। লক্ষণীয়, গভীর ও চওড়া বিভাজিত অংশগুলি ('রথ' বিন্যাস) নিচু থেকে একেবারে সোজা উঠে গেছে ওপরে শীর্ষদেশ পর্যন্ত।

দেউলটি একটি উচ্চ ঢিবির ওপর অবস্থিত। জানা যায়, ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ওই অঞ্চলের সে সময়ের জমিদার ওই স্থানের মাটি খুঁড়তে খুড়তে একটি তাম্রফলকে খোদিত লিপি আবিষ্কার করেন। এটি ছিল একটি তাম্রশাসন। সেটি থেকে জানা যায়, ৮৯৭ শকাব্দ বা ৯৭৫ খৃস্টাব্দে জনৈক রাজা জয়ন্ত ওই দেউল প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বমুখী দেউলটির প্রবেশপথ ন' ফুট ছ' ইঞ্চি। গর্ভগৃহে প্রায় সাতফুট সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। প্রায় সব প্রাচীন মন্দিরের গর্ভগৃহ সমতলভূমি থেকে অনেকটা নিচুতে থাকে। যেমন, বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর, পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু কিছু মন্দির, জলপাইগুড়ির জটিলেশ্বর, জল্পেশ প্রভৃতি প্রাচীন মন্দিরে এই ধরনের গর্ভগৃহ লক্ষ্য করা গেছে। জটার এই দেউলটি বহুবার সংস্কার করা হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। এটি একটি বহু প্রাচীন দেবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এটিকে একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তিরূপে ঘোষণা করে কিছু সংস্কার করা হয়েছে।

জটার এই দেউলের মতো আরও একটি দেউল কুলতলা থানার দেউলবাড়ি দ্বীপে ছিল বলে জানা যায়। আর একটি ওইরূপ 'রেখ' দেউল মন্দির ছিল পাথরপ্রতিমা থানার বনশ্যামনগর গ্রামে নদীতীরে। এর থেকে অনুমান করা যায়, ওইসব স্থান এককালে খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

দক্ষিণ চবিবশ পরগণায় আরও বহু পরে (শেষ মধ্যযুগে) অনেক মন্দির তৈরি হয়। তাদের অনেকগুলিই এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

অঙ্গনা

সন্তানের পাশে সহজ ও সহযোগী হিসেবে দাঁড়ান মায়েরা

ইন্দিরা রায়

শারদোৎসবের পালা শেষ হওয়া মানেই ছোটদের মুখগুলো সব কালো হয়ে ওঠা। এত মজা এত আনন্দের পর এবার তো সামনে শমন এসে দাঁড়াবে। আবার সকাল থেকে রাত অবধি চলবে পড়া পড়া আর পড়া। স্কুল— তারপর পড়াতে আসা বা পড়তে যাওয়া। সামনেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা দরজায় টোকা দিচ্ছে, বলছে— এইবার তৈরি হয়ে নাও। আমি এসে গেছি।

এই ভীতি চিরদিনই সবারই শিশুবেলায় অর্থাৎ ছাত্রজীবনে এসেছে। প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। কিন্তু তখনকার পড়াশোনায় এত ভীতি ছিল না। পরীক্ষার জন্য ভয় লাগলেও এখনকার মতো আতঙ্কিত হওয়ার কিছু ছিল না। শুধু পাশ/ফেলের চিন্তা আর ভাল নম্বর তোলার চিন্তা। কিন্তু এখন সময়টা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। কারণ প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা এসেছে। তুলনামূলক ব্যাপারটাও ভীতি জাগাচ্ছে— মা'দের কথা ঃ ও এত ভাল রেজাল্ট করেছে। তোমাকেও ওর মতো করতে হবে। তার ওপর পড়ার চাপ। বাবা-মার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে পড়া ভাল তৈরি থাকলেও কোথায় যেন একটা ভয় কাজ করেছে এখনকার ছেলেমেয়েদের মনে। এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল বাড়িয়ে তুলতে, সাহস জোগাতে কয়েকজনের অভিমত বা পরামর্শ জানতে চাই; যাতে তারা মনে জোর পায়, ভরসা করতে পারে।

অর্ণব ব্যানার্জি (মনস্তত্ত্ববিদ) ঃ পুজো ও পরীক্ষা প্রস্তুতি এখনকার পড়াশোনার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকতা হলো, যতটা সম্ভব সহজ থাকা কিংবা সহজ রাখা। সহজ থাকবে কে? যে ক্যান্ডিডেট সে নিজে। কেন থাকবে? কেননা সহজ না থাকলে জীবন জটিল হয়ে পড়বে, এই জটিলতা তার জীবনপথে অন্তরায় হয়ে উঠবে। জীবনের কথাই হলো— সহজে ফিরিয়া আসা, সহজের মাঝে। অর্থাৎ, পুজো আসবে, আনন্দের ঝুলি নিয়ে। সেই আনন্দধারায় স্নান না করলে জীবনের যে বিরাট একটা বঞ্চ না থেকে যায়। বিশেষ করে এই বয়সে পুজোর আনন্দের অনুভূতি অন্যরকম। যা কোনওদিনই অন্যবয়সে ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু পুজোর অনুষ্ঠানের মতো নিজেকে যদি সংযত রাখা, সংযত থাকার একটা আবহাওয়া তৈরি হয়, তাহলে পুজোর পরে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে খুব বেশি পরিশ্রম হবে না। অভিভাবকদের সহায়ক ভূমিকা নিতে হবে, যাতে শুধু শাসন নয়, অনুশাসন নয়; সহানুভূতির ও সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে ওদের পাশে থাকতে হবে।

পারমিতা মিত্র ভৌমিক
(কনসালট্যান্ট ক্লিনিক্যাল ও
রিহ্যাবিলিটেশন সাইকোলজিস্ট)

পড়ার ওপর ও ছেলেমেয়েদের ওপর প্রেসার হচ্ছে দু' তিনটে কারণের জন্য। আগে আমাদের পরিবারে একের বেশি সন্তান হোত। ফলে সবার প্রতিই বিশেষ নজর দিতে পারতেন না বাবা-মায়েরা। সবাই এর মধ্যে তারা বড় হয়ে উঠত। কিন্তু এখন একটি বা

দুটি সন্তান হওয়ায় দেখা যায়, বিশেষ করে পেরেন্টদের দিক থেকে যে, তাঁরা ছেলেমেয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চান। তাদের ওপর সব দিক দিয়ে প্রেসার পড়ে। এই প্রেসারটা ঠিক নয়।

প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব ক্ষতিকর। দেখতে হবে যে তার মধ্যে কতটা পোটেনশিয়ালিটি আছে। হয়ত সেই শিশুটির তা নেই, সে নেবে কি করে? এটা প্রথম থেকে ভাবতে হবে। সেভাবে তাকে তৈরি করতে হবে। অনেক সময়ে দেখা যায়, হয়ত সন্তান কোনও এক বছর পরীক্ষায় ফেল করল। পরের বছর পাশ করল সন্তোষজনক নম্বর পেয়ে। কিন্তু বাবা-মা তাতে খুশি হলেন না। কিন্তু তার কতটুকু নেবার ক্ষমতা সেটা তো বুঝতে হবে। প্রথমত, পরীক্ষা আগে যেমনভাবে হোত, সে ভাবে গোল উদ্দেশ্যে চার্ট করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সব কিছুর মধ্যে ডিসিপ্লিন, রেগুলারিটি থাকা দরকার। বাবা-মার একটা প্রবণতা যে, এখন পারছো না তো ওভার নাইট পড়তে হবে। তাদের যে একটা কিছু হতেই হবে, না হওয়াটা অন্যায়— তা কিন্তু নয়। শুধু অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের ওপর একটা জীবনের মূল্যায়ন হয় না। তার ব্যক্তিত্বকে অন্য ভাবেই জাগিয়ে তোলা যায়।

মায়েরা যদি এমন কিছু করেন যেটা শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর— সে কাজ কখনও করবেন না।

আরেকটা কথা, পরীক্ষার সময়ে যে বাবা-মা ছুটি নিয়ে ছেলেমেয়ের সামনে বসে থাকেন, এটা কিন্তু ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে মোটেই ভাল হয় না। এতে আরও আরো ভীত হয়ে পড়ে।

শ্যামশ্রী রায় (প্রাক্তন শিক্ষিকা, নারী শিক্ষা মন্দির)—পড়াশোনার ধরনটাই বদলে গেছে। আমরা যখন শিক্ষিকা ছিলাম, আমরা ক্লাসে মেয়েদের এমনভাবে পড়াতাম যে ওদের স্কুলেই পড়াটা তৈরি হয়ে যেত। তাছাড়া, মেয়েরাও বাধ্য ছিল। সিলেবাসও নির্দিষ্ট থাকত। এখন সিলেবাসের চাপ অনেক বেশি। এখনকার টিচাররা ক্লাসে না করিয়ে সবই প্রায় বাড়িতে করে আসতে বলেন। না বুঝে ওরা পারবে কী করে! তা ছাড়া, এখন কোচিং-এ পড়তে না গেলে হবে না। সেখানেও পক্ষপাতিত্ব আছে, আছে প্রতিযোগিতা। যা হোক, তবু আমি বলব— তোমরা যার যা পড়া মন দিয়ে তৈরি কর। মনকে একাগ্র কর। কে ভাল করল, আমাকে ওর মতো হতে হবে— এই চিন্তা করবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পড়াশোনা কর, দেখবে ভয় থাকবে না। রেজাল্টও ভাল হবে। বিশিষ্টজনদের মতামতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পেছনে মায়েদের অত্যধিক নজর, উচ্চাশা এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব জাগিয়ে তোলা মোটেই উচিত নয়। ওদের মতো করে ওদের দক্ষতা অনুযায়ী তৈরি হতে দিন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পথ খোলা আছে। ওদের সহজ হতে দিন, আপনারাও সহজ হন, সহযোগী হন ওদের পাশে, পরামর্শ দিন, কিন্তু চাপ দেবেন না।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ১৬

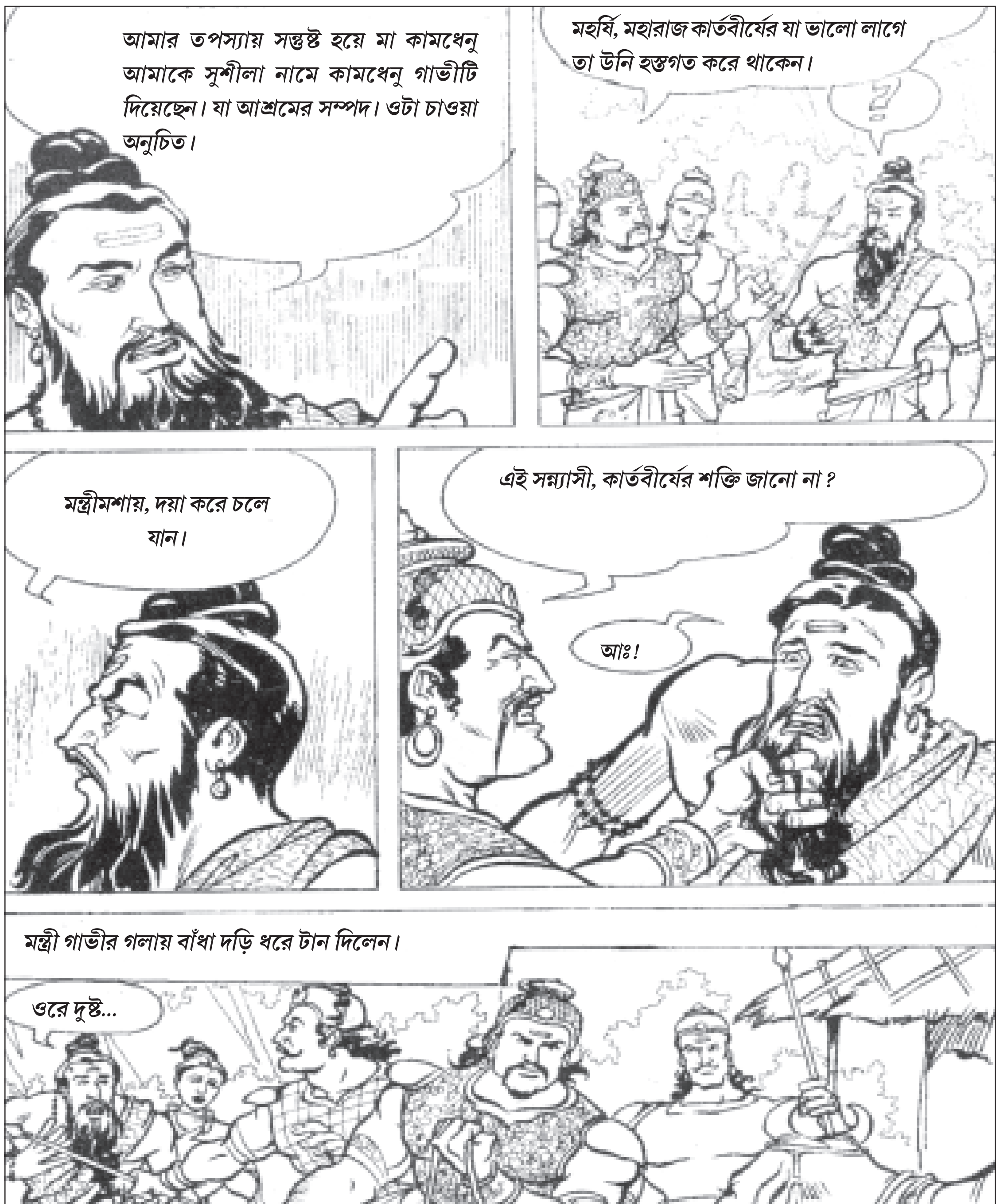

আনন্দবাজারের সেকাল এবং...

শিবাজী গুপ্ত

সেকালের 'আনন্দবাজার' ছিল সংবাদপত্র জগতের মুকুটমণি, জনমতের অগ্রণী সৈনিক, জাতীয় স্বার্থের জাগ্রত প্রহরী। স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্মের মর্যাদা রক্ষায় অকুতোভয়। আর সেকারণে ইংরেজ শাসনেই হোক, আর মুসলিমলীগ আমলেই হোক, সরকারি অবিচার, অনাচার, পক্ষপাতিত্ব ও দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে আনন্দবাজারের সাংবাদিকদের ক্ষুরধার লেখনী সদা সরব ছিল। সম্পাদকের অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় মন্তব্যের জন্য সম্পাদক ও পত্রিকা পরিচালকবর্গকে জেল খাটতে হয়েছে, জরিমানা দিতে হয়েছে; মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে।

তখন তো দেশে বিষবৃক্ষ স্বরূপ সেকুলারজিমের বীজ রোপিত হয়নি এবং তার বিষাক্ত রস হিন্দুদের দেহে সংমিশ্রিত হয়নি। ফলে হিন্দু স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ও লঙ্ঘিত হলেই জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি ফুঁসে উঠত। তর্জনে গর্জনে সরকারকে যেমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলত; তেমনি হিন্দুসমাজের দুর্বলতা ও দোষ ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে এবং আত্মরক্ষা ও মা-বোনের ইজ্জত রক্ষায় সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য ডাক দিতেও সঙ্কোচবোধ করতো না।

১৯২৬ সালে পাবনা, ঢাকা ও কলকাতার দাঙ্গার পর থেকে মুসলমানরা —শিক্ষিত মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়পুষ্ট মুসলিম গুণ্ডারা— হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়া এবং কারণে-অকারণে হিন্দুসমাজের উপর চড়াও হওয়া একটা লাভজনক পেশা বলে গণ্য করতে থাকে। বিশেষত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর অত্যাচারী মুসলিম পুলিশ কর্মচারী আসানউল্যা বিপ্লবীদের হাতে নিহত হলে মিলিটারি ও পুলিশের সহায়তায় মুসলমানরা যে নৃশংসতা ও বর্বরতায় হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগে পর্যন্ত তার তুলনা মেলা ভার। শুধু চট্টগ্রাম জেলাই নয়, তারপর থেকে পূর্ববঙ্গের সব জেলাতেই কমবেশি অত্যাচারের ঘটনা ঘটতে থাকে হিন্দুদের উপর। সেগুলিকে অনেক ক্ষেত্রে নিছক ডাকাতি বলে চালিয়ে দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু ডাকাতি করতে এসে মুসলমান ডাকাতরা শুধু টাকা-পয়সা, ধনদৌলত অপহরণেই ব্যাপৃত থাকত না— হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি-ভাঙা, হিন্দুমন্দির তছনছ করা, নারীদের মানইজ্জত হানি ও খুন জখম করতেও ছাড়ত না। এসব ডাকাতিকে ডাকাতি না বলে 'মিনি দাঙ্গা' বলতে বাধা কোথায়?

> **তখন তো দেশে বিষবৃক্ষ স্বরূপ সেকুলারজিমের বীজ রোপিত হয়নি এবং তার বিষাক্ত রস হিন্দুদের দেহে সংমিশ্রিত হয়নি। ফলে হিন্দু স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ও লঙ্ঘিত হলেই জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি ফুঁসে উঠত। তর্জনে গর্জনে সরকারকে যেমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলত; তেমনি হিন্দুসমাজের দুর্বলতা ও দোষ ত্রুটির**

গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের উপর এই 'মিনি' দাঙ্গা চলছে বিনা বাধায় বিনা প্রতিরোধে এবং সর্বক্ষেত্রেই হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা মুসলিম ভোট পকেটস্থ রাখতে এসব ঘটনাকে ডাকাতি বলে চালাতে চেষ্টা করে এবং সাক্ষীসাবুদের অভাবে মামলা ডিসমিস হয়ে যায়— মুসলমানরা মুসলমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় না, আর হিন্দুরা সাক্ষ্য দিতে ভয় পায়; কারণ সাক্ষ্য দিলেই বাড়ি ফেরার পথে কোতল হবার ভয়।

এই প্রেক্ষিতেই চট্টগ্রামের বিপন্ন হিন্দুদের জন্য রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ও সমকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাক ঃ

চট্টগ্রামের বিপন্ন হিন্দু—রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি

চট্টগ্রামে সম্প্রতি হিন্দুদিগের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে, উক্ত ঘটনায় কবি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামের উৎপীড়িত অধিবাসীদিগের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। ফ্রী প্রেস সানন্দে জানাইতেছে যে কবি রবীন্দ্রনাথ গত সোমবারের গীত উৎসবের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে উক্ত উৎপীড়িতদের সাহায্যর্থে ১০০০ টাকা দিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন— ফ্রী প্রেস। (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১/৩০ ভাদ্র ১৩৩৮) সমগ্র পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের অসহায় ভাবে মুসলমানের হাতে নিপীড়িত হওয়ার এক করুণ চিত্র বর্ণিত হয়েছে তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায়—তৎসহ হিন্দুদের আত্মরক্ষার পথও নির্দেশ করেছে—

"উপদ্রুত হিন্দু"

চট্টগ্রামের উপদ্রুত হিন্দুদের সাহায্যের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ অভিনয়লব্ধ অর্থ হইতে সহস্র মুদ্রা দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সংখ্যাল্প ও নানাভাবে দুর্বল হিন্দুর উপর এই অকথ্য পীড়নের সংবাদে কবির হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। পাবনা, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে কয়েক বৎসরের লুণ্ঠতরাজ, দাঙ্গা -হাঙ্গামা হইতে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সংখ্যাল্প শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুরা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ধর্মের ধুয়া ছলনা মাত্র— রাজনৈতিক কারণই মুখ্য। রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা আজ রাষ্ট্রনীতিতে প্রবল হইয়া যে ভেদবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, যেভাবে বিদ্বেষ মর্মান্তিক করিয়া তুলিতেছে, এ সকল তাহারই অভিব্যক্তি। ইহার জন্য শাসকবর্গকে দোষ দিবার চেষ্টা নিষ্ফল। আজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হইবে, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে পাপ আছে এবং তাহা আছে বলিয়াই একে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা সহজ। এই পাপ যতদিন দূর না হইবে, ততদিন এই শ্রেণীর উৎপাত ও লাঞ্ছনার জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ঘটনা পরম্পরার তিক্তস্মৃতি হইতে আমরা বারম্বার বলিয়াছি,— আজ হিন্দু সমাজকে উপদ্রুত হিন্দুদের রক্ষার উপায় বিধান করিতে হইবে। সমগ্রের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত হিন্দু আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। আমরা সকলের প্রতি দয়াহীন আত্মপরায়ণ, সামাজিক কর্তব্যবোধহীন এবং বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিব— আর আমাদিগকে রক্ষা করিবে পুলিশ, এমন ভ্রান্তধারণা পোষণ করার মতো মূঢ়তা আর নাই। সংখ্যাল্প বলিয়া নহে, এই মূঢ়তাই হিন্দুকে আজ বিপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষত বাঙালী হিন্দুর শিক্ষা ও চরিত্রগত এক অতি নিন্দনীয় ত্রুটি,— তাহাকে উদারতার নামে মনে ও মুখে এমন ভণ্ড করিয়া তুলিয়াছে যে সে নানা বড় বড় কথার আবরণে উপস্থিত বিপদের দায়িত্ব এড়াইয়া ব্যক্তিগতভাবে নিরাপদ হইতে চাহে এবং সমষ্টির বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করে।...

এই আত্মবিস্মৃতির মোহ হইতে হিন্দুকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্যই হিন্দু সংগঠন আন্দোলন। নিজেদের অভ্যন্তরীণ সামাজিক আবর্জনা ও ভেদনীতি পরিহার সম্পর্কে সমগ্র সমাজকে অবহিত করিয়া তুলিবার জন্য হিন্দু মহাসভার আন্দোলন এখনও বাঙালী হিন্দু তেমনভাবে গ্রহণ করে নাই। এবং তাহা করে নাই বলিয়াই আজ চট্টগ্রামের সাহায্য প্রত্যাশী উপদ্রুত হিন্দু সমগ্র সমাজের নিকট বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি পাইতেছে না। কেবল পরের দোষের প্রতি অহোরাত্র সচেতন থাকিয়া সমালোচনা করাই হিন্দুকে রক্ষা করার পথ নহে, ইহা অতি বুদ্ধিমান বাঙালী হিন্দু প্রধানগণ যত শীঘ্র বুঝিতে পারেন, দেশের পক্ষে ততই কল্যাণ। (আনন্দবাজার পত্রিকা- ১৮.৯.১৯৩১)।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার পাঠকদের কাছে তো এ ধরনের সম্পাদকীয় মন্তব্য হিন্দুত্ববাদী পত্রিকার বা দলের বক্তব্য বলেই প্রতিপন্ন হবে। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবাংলার হিন্দু সমাজের উপর একশ্রেণীর মুসলমান গুণ্ডাদের যে ধরনের অত্যাচার চলছে, তার সঙ্গে গত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের অত্যাচারের হুবহু মিল দেখা যায়। কিন্তু পত্রপত্রিকায় নিন্দাসূচক সম্পাদকীয় তো দূরের কথা, অত্যাচারিত হিন্দুদের খবরও প্রকাশিত হয় না। এসব ঘটনা যদি ডাকাতিই হবে— তবে গ্রামের লক্ষপতি কোটিপতি মুসলমান বাড়িতে তো একটিও ডাকাতি হয় না! হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলি আর কতদিন শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন?

উত্তরবঙ্গ প্রান্ত-কার্যকারিণীর বৈঠকে ভাইয়াজী

গত ২০ ও ২১ নভেম্বর মালদা অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশু মন্দিরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর বৈঠক হয়ে গেল। এই বৈঠকের শেষে ২১ নভেম্বর স্বয়ংসেবক সম্মেলনে সময়োচিত বক্তব্য রাখেন সরকার্যবাহ মাননীয় সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী)। উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী, ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, ক্ষেত্র কার্যবাহ অজিত মহাপাত্র প্রমুখ।

৬০০ জন স্বয়ংসেবকের উপস্থিতিতে ব্যায়ামযোগ, নিবুদ্ধ সহ শারীরিক কার্যক্রম হওয়ার পর ভাইয়াজী স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশে বলেন— "সম্প্রতি গৈরিক সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দু আতঙ্কবাদ নিয়ে যে ভাবে কংগ্রেস সরকার মিথ্যা দোষারোপ করে হিন্দু সমাজকে অপমান করছে, তার যোগ্য জবাব সমাজ অবশ্যই দেবে।" দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বলতে গিয়ে ভাইয়াজী বলেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সরকার উগ্রপন্থীদের দমনের নামে নরম মনোভাব দেখাচ্ছে ও সেনাদের মনোবল নষ্ট করে দিচ্ছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সমাজ জাগরণের কাজ করে যেতে হবে।

এর আগে ২১ নভেম্বর সকালে ভাইয়াজী গুরুনানক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে পুরাতন মালদার ঐতিহ্যশালী গুরুদোয়ারাতে গিয়ে গুরুনানকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, এই গুরুদোয়ারাতে গুরুনানক অসম যাবার পথে সাড়ে তিনমাস অবস্থান করেন। এছাড়া গুরু তেগবাহাদুরও নয় দিন এখানে কাটিয়েছিলেন।

সেবিকা সমাচার

গত ২৪ থেকে ২৮ অক্টোবর তিনদিনব্যাপী উত্তরবঙ্গের কালিয়াগঞ্জের দরিমানপুরে বি এস সি হাইস্কুলে রাষ্ট্র সেবিকা-সমিতির একটি বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। বর্গে উদ্বোধনী ভাষণ দেন বি এস সি হাইস্কুলের শিক্ষক গৌরহরি চক্রবর্তী। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা জনকল্যাণ সমিতির সংযোজক মটুকেশ্বর পাল। বর্গের সর্বাধিকারী ছিলেন বি এস সি হাইস্কুলের শিক্ষিকা সুজাতা চক্রবর্তী। এছাড়াও বর্গে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার, ভারত-বাংলাদেশ সীমা সুরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত এম এল শুক্লা প্রমুখ।

তিনদিনের বর্গে ৯ জন অধিকারী, ৬ জন শিক্ষিকা, ৭৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

☛ ☛ ☛

গত ৩০ ও ৩১ অক্টোবর দু'দিনব্যাপী মালদা জেলার বাচামারী বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩৬ জন বিদ্যার্থী, ১২ জন আচার্যা, ৩ জন অধিকারী ও ৪ জন শিশু-মন্দিরের সেবিকা যোগদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সমিতির অভিভাবিকা বন্দনা রায়।

☛ ☛ ☛

গত ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর সিকিমে প্রচারিকাদের প্রশিক্ষণবর্গ অনুষ্ঠিত হলো। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৪২ জন প্রচারিকা উপস্থিত ছিলেন। এতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১ জন যোগদান করেন। সমিতির ৮ জন অখিল ভারতীয় অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ শেষে সেবিকারা দার্জিলিং-এ ভগিনী নিবেদিতার সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

পরলোকে অরুণেন্দু সরকার

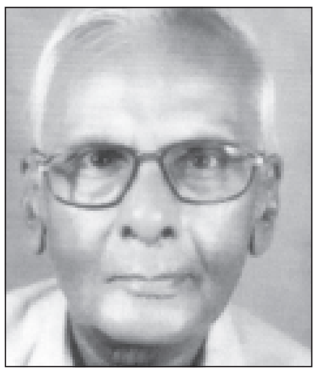

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ডঃ অরুণেন্দু সরকার গত ১৭ নভেম্বর সকালে পরলোক গমন করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুদের রেখে গিয়েছেন।

বাংলাদেশের রংপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর তাঁদের পরিবার নদীয়ায় চলে আসেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস সি পাশ করেন ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। কিছুদিন আমেরিকার টেক্সাসে অধ্যাপনার পর পাকাপাকিভাবে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি গ্লাইউডে অগ্নিনিরোধক রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কারের গবেষণায় সফল হন।

আবাল্য স্বয়ংসেবক অরুণেন্দুদা বিভিন্ন দায়িত্বের পাশাপাশি বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গ)-এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

শোক সংবাদ

গত ৬ নভেম্বর মধ্যরাত্রে তাম্রলিপ্ত জেলার তমলুক মহকুমা কার্যবাহ দেবাশীষ পাখিরা-র পিতা প্রফুল্ল পাখিরা পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রীসহ একপুত্র, তিন কন্যা, নাতি-নাতনী রেখে গেছেন।

☛ ☛ ☛

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দুর্গাপুর নগরের স্বয়ংসেবক, সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ প্রশিক্ষণ বর্গ শিক্ষাপ্রাপ্ত মধুসূদন দেবনাথের মাতৃদেবী গত ১১ নভেম্বর রাত্রিতে ৯০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৮ পুত্র ১ কন্যা সহ ১৮ জন পৌত্র-পৌত্রী ও ১৫ জন প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী বর্তমান।

খেলার জগৎ

২০১০ সাল : ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল দিক্‌চক্রবাল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন একবিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে জীবন ও সমাজের সবক্ষেত্রে নবজাগরণ ঘটবে ভারতবর্ষের। মানবসভ্যতাকে সত্যসুন্দর করে গড়ে তুলতে বেদান্ত দর্শনের আঁধারে নতুন নতুন কল্পনা ও চিন্তাশক্তির সঞ্জীবনী প্রেরণা আবশ্যক। জ্ঞান ও চিন্তার নবতরঙ্গে ভেসে যাবে সমাজ মানস, তার ভরকেন্দ্র হবে ভারতবর্ষ। আর খেলার মাঠ যে জীবনমুখী শিক্ষার আঁতুড়ঘর। সেই খেলা ও শরীরচর্চার মানচিত্রে আজ ভারত খানিকটা হলেও একটা বৃত্ত রচনা করতে পেরেছে। সাম্প্রতিক কমনওয়েলথ গেমস এক স্বপ্নমহিত দিকচিহ্ন তুলে ধরেছে। তবে শুধু কমনওয়েলথ গেমসই নয়, গোটা ২০১০ সালটাই বিশ্বজুড়ে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের পারফরমেন্স চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ভারতকে আর অবহেলা বা অস্বীকার করা যাবে না।

সাফল্যের মণিমুক্ত খুঁজতে বসলে প্রথমেই যে নামটি উঠে আসে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম বিশ্বনাথন আনন্দ। দুই যুগ ধরে দাবা বোর্ডের রাজপুত্র। সমসাময়িক সুপার গ্রাণ্ডমাস্টার গ্যারি কাসপারভ যদি সম্রাট হন তবে আমাদের 'ভিসি' অবশ্যই রাজপুত্র। আর গ্যারির অবসরের পর তিনিই একজন অধিপতি। এবছর বালগেরিয়ান চ্যালেঞ্জার ভ্যাসিলিন টোবালভ-কে হারিয়ে নিজের বিশ্বখেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তার সঙ্গে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবও নিয়ম করে জিতে চলেছেন। বহির্বিশ্বে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আমজাদ আলি খান, অমর্ত্য সেন, যোগগুরু রামদেবের সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তার নাম কৃতী ভারতসন্তান হিসেবে। আর আনন্দের গৌরবগাঁথার অভিজ্ঞান চিহ্ন ধরে উঠে এসেছেন সূর্যশেখর গাঙ্গুলি, কৃষ্ণাণ শশীকিরণের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃত গ্রাণ্ডমাস্টাররা। আনন্দের ভাবশিষ্যা কোনেরু হাম্পি আজ বিশ্বের দুনম্বর

বিশ্বনাথন আনন্দ

দাবাড়ু।

দাবার মতোই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে শ্যুটিংয়ে। অভিনব বিন্দ্রার অলিম্পিক সোনা জয়ের ভাবাবেগ এতটাই উদ্দীপ্ত করেছে অন্যান্য ভারতীয় শ্যুটারদের যে গগণ নারাং এবছর বিশ্বরেকর্ড করে ফেলেছেন। ইউরোপে এক আন্তর্জাতিক মিটে নিজ বিভাগে ৬০০-৬০০ স্কোর করে এই অসামান্য কীর্তি স্থাপন করেন গগণ। তারপর দিল্লির কমনওয়েলথ গেমসে চারটি সোনা জিতে দ্বিতীয় সেরা ক্রীড়াবিদের স্বীকৃতি পান। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারু অ্যালিসিয়া কুটস পাঁচটি সোনা জেতার সুবাদে 'ডেভিড ডিক্সন' খেতাবে ভূষিত হন। গগণের মতোই বিগত বছরে মানবজিৎ সিং সান্ধু, ওমকার সিং, তেজস্বিনী আওয়ান্ত, রঞ্জন সোধীরা ভারতীয় শ্যুটিংয়ের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছেন দেশে বিদেশে। তবে এশিয়াডে তারা তাদের ওপর অর্পিত আস্থার প্রতিফলন দিতে পারেননি।

অন্যদিকে অপর টার্গেট ইভেন্ট তিরন্দাজিতে প্রত্যাশার তুলনায় একটু বেশিই প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। চীনের সাংহাইতে বিশ্ব তিরন্দাজির দলগত বিভাগে ভারতের পুরুষ দল চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, থাইল্যাণ্ডের কড়া বাঁধা টপকে চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে বঙ্গতনয় রাহুল ব্যানার্জির নিখুঁত লক্ষ্যভেদে। রাহুল তাঁর কীর্তিশৌর্য মেলে ধরেন তার কয়েকদিন পরেই দিল্লির কমনওয়েলথ গেমসে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতে। রাহুলের সঙ্গী তরুণদীপ রাই, জয়ন্ত তালুকদার, মঙ্গল সিং চাম্পিয়া এবছর জীবনের সেরা পারফরমেন্স করেছেন। রাহুলের দিদি দোলা অবশ্য তাঁর কেরিয়ারের গোধূলি লগ্নে পৌঁছে গেছেন। একদা বিশ্বসেরা দোলা এবছর মোটামুটি হতাশই করেছেন। উঠে এসেছেন ঝাড়খণ্ডের ১৮ বছরের তরুণী দীপিকা মাহাতো, তুলে নিয়েছেন কমনওয়েলথ-এ সোনা।

কুস্তিতে সুশীল কুমার প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী সুশীল প্রতিদিনই উন্নতি করেছেন। লন্ডন অলিম্পিকে তাঁর কাছ থেকে সোনা আশা করা যেতেই পারে। অন্যদিকে বেজিং অলিম্পিকে বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জজয়ী বিজেন্দার কিন্তু গ্লামার জগতের হাতছানিতে নিজের দায়বদ্ধ তা ভুলে গেছেন। কমনওয়েলথে পদক না পাওয়ায় তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রত্যাশার ফানুসটি চুপসে গেছে। গত বছরও তিনি মস্কোয় বিশ্ব বক্সিংয়ে পদক জিতেছিলেন। তবে বিজেন্দর কমনওয়েলথ-এর আফসোসটা অনেকটা পুষিয়ে দিয়েছেন এশিয়াডে, সোনা জিতে। অন্যদিকে মহিলা বক্সার মেরিকম কিন্তু জীবনের থেকেও বড় হয়ে উঠেছেন। পরপর পাঁচবার বিশ্ব খেতাব ধরে রাখতে পেরেছেন এই মণিপুরী মহিলা। এদেশের মহিলাদের কাছে প্রেরণা ও আত্মপ্রত্যয়ের মূর্ত প্রতীক মেরিকম। যেমন সাইনা

মেরিকম

নেহ্ওয়াল প্রতি বছরই নিজেকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন।

সাইনার সোনাই কমনওয়েলথ গেমসে ইংল্যাণ্ডকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে তুলে নিয়ে এসেছে ভারতকে। এবছর অল ইংল্যাণ্ড সেমিফাইন্যালিস্ট একাধিক মাস্টার্স খেতাব জয়ী সাইনা বর্তমানে বিশ্বের দু'নম্বর ব্যাটমিন্টন খেলোয়াড়। একমাত্র বিশ্বসেরা চীনা মেয়েরা ছাড়া কোনও দেশের কেউই তাঁর সামনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে না। নিষ্ঠা সাধনা, খেলার প্রতি নিখাদ প্রেম আজ সাইনাকে এই জায়গায় তুলে নিয়ে এসেছে যা থেকে শিক্ষা নিলে তার প্রতিবেশী সানিয়া মির্জা উপকৃত হবেন।

এশিয়াডে ভারতের শ্যুটিং-এর ব্যর্থতা পুষিয়ে গেছে বক্সিং এবং অ্যাথলেটিক্স-এ। বিজেন্দার ছাড়াও কৃষাণ বিকাশ বক্সিং-এ সোনা জিতেছেন। অ্যাথলেটিক্স-এ এসেছে ৫টি সোনা। তার মধ্যে মেয়েরাই পেয়েছেন চারটে। মেরিকম, সাইনা নেহ্ওয়াল, দীপিকা মাহাতো বা কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে প্রথম সোনাজয়ী অ্যাথলিট-ডিসকাস থ্রোয়ার কৃষ্ণা পুনিয়ারাই যে মা সারদার ভাব ও বাণী শরীর। এদেশের মেয়েরাও যে সব বাঁধা অতিক্রম করে সাফল্য ও গৌরবের আইভরি টাওয়ারে উঠতে পারে, দিব্যজননী সারদাদেবীর এই স্বপ্ন যেন ডানা মেলে উড়তে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের ১৭৫ বছর পূর্তি হচ্ছে আর কিছুদিন পরেই। এই মাহেন্দ্রক্ষণে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা সেই সত্যে উন্নীত হচ্ছেন, যার একটাই অর্থ এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

হিন্দু তুমি কী পথ হারিয়েছ?

বিশাখা বিশ্বাস

সবাই পাথর ছুঁড়ছে, সকলেই হল্লা করছে। সরকারী সম্পত্তি নাশ হচ্ছে, থানা ভাঙছে, চৌকি পুড়ছে, সরকারী অফিসের কাগজপত্র জ্বলছে। সামনে শিশু, পরেই মহিলা, তার পেছনেই ক্ষুব্ধ জনতা। মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে "ইন্ডিয়া ভাগ যাও"— "গো আউট হিন্দুস্থান"! প্রচার আলাদা মাত্রা পেয়ে গেছে, বিক্ষোভ বিদ্রোহের অবয়ব গ্রহণ করেছে, শান্তি-সাম্য-মৈত্রী এখন গুহাবাসী। সামনে বোড়ে, পেছনে মন্ত্রী, আরও পিছে খোলাপথে নৌকো— অশ্বপৃষ্ঠে সমুখে তালিবান, হাঁটা পথে আল কায়েদা, পেছনে আই এস আই, সবাই শক্তিশালী। শক্তিশালী সেই জিহাদিদের মুখে জিহাদের বাণী— লক্ষ্য কাশ্মীরে 'জম্ হরিয়ৎ'।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা কেবল মলমূত্র ছাড়া ত্যাগ করেনি কোনওকিছু, স্বাধীনোত্তর ভারতের সাম্প্রতিকতম প্রধানমন্ত্রী সততার ভগীরথ মনমোহন সিং বলেছেন 'ভারতবর্ষের সম্পদের ওপর, মুসলমানদেরই সর্বোচ্চ অধিকার'। সর্বোচ্চ অধিকারের সেই পাঞ্জা হাতে নিয়ে ভারতের সেই সর্বোচ্চ ভূস্বর্গটিকে তাই ওদের সর্বাগ্রে চাই। পেছনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার দাপট আছে, পাশে ইসলামি জোটের হুমকি আছে, সম্মুখে ভারতবিরোধী গিলানিরা আছেন, রাজকর্মচারীগণের মধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের স্যার রবি ইন্দর সিং আছেন, হাই কমিশনারদের মধ্যে ম্যাডাম মাধুরী গুপ্তা আছেন— তাই যদিও পীচগলাপথ, সামনে উৎরাই, ভয় কী ভাই এগিয়ে চলো— কুরআনে আল্লার বড় কেউ নাই।

অতএব, কংগ্রেস-জননী অন্তরাত্মায় বিবেকধারী খোদ সনিয়াজীকেও বলতেই হয় ঃ কিছু পেতে চাও? তো, বড় ত্যাগের জন্যে তৈরি হও! ইনসাল্লা!

ত্যাগ? আর কত ত্যাগ করে কত বড় হবে এই খণ্ডিত 'খণ্ড ভারত'? যে ঋষি পরশুরামের পদধূলিতে পবিত্র পারস্যে (সাম্প্রতিক ইরাণে) সূর্যসাধনায় একদিন উচ্চারিত হোত ভারতমহিমার বাণী, সেখানে আজ কেবল আল্লা হো আকবর' ধ্বনি শোনা যায়, সর্বধর্ম সমন্বয়ের খোলে সেকুলারিজিমের 'বোল্' শোনা যায় কেবল এই খণ্ডিত ভারতবর্ষে। যে গান্ধার কন্যা জননী গান্ধারী একদিন ছিলেন ভারতসাম্রাজ্ঞী, সেই গান্ধারীর আফগানিস্থানে আজ কেবল পয়গম্বরের মহিমাই কীর্তিত হয়, 'ঈশ্বর-আল্লা তেরে নামে'র অমৃতধারা প্রবাহিত হয় কেবল এই খণ্ডিত ভারতের গঙ্গা আর যমুনায় (সূত্র-মহাভারত)। সে সপ্তসিন্ধু তীরে একদিন ঘোষিত হয়েছিল 'অসতোমা সদগময়ো তমসোমা জ্যোতির্গময়' সেখানে আজ কেবল কুরআনের বাণীই মাত্র শ্রুত হয়— হিন্দু-মুসলীম-কেরস্তানের মিলনবাঁশী বাজে কেবল এই খণ্ড-বিখণ্ড ভারতবর্ষের মাটিতে।

অতএব, কাশ্মীরের এ লড়াই নয় সাধারণ লড়াই— এ লড়াই ইসলাম প্রতিষ্ঠার লড়াই। এ লড়াইতে অংশ নিলে হাতের মুঠোয় নিশ্চিত বেহেস্ত, না নিলে তা 'মুরতাদ'। অস্যার্থ ঃ গিলানীর নির্দেশ— কাশ্মীরী শিখেরা হয় ইসলাম গ্রহণ করো, নয়তো কাশ্মীর ছাড়ো।

এদিকে এখানে অনুপ্রবেশের প্রবেশদ্বার এই পশ্চিমবঙ্গ হয়েই নিয়ত চলেছে 'ভারত ভরো'-র অভিযান। 'ভারত ভরো'-র সেই সাইলেন্ট ইনভেসনে খোদ ধর্মনিরপেক্ষতার এই সিদ্ধপীঠ মরল্যানটিতেও চলেছে মসজিদ-মাদ্রাসার নির্মাণ, ইদ্গা-কবরস্থানের নিত্য সম্প্রসারণ। সম্প্রতি এখানে কবরস্থান এতটাই সম্প্রসারিত ও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে যে, দেগঙ্গা থেকে কদম্বগাছি পর্যন্ত চলেছে হিন্দুত্ব অপহরণের ইসলামি অভিযান। সেই অভিযানে বেলিয়াঘাটা, কার্তিকপুর, বিশ্বনাথপুর, বেড়াচাঁপা জুড়ে বন্ধ হয়ে গেছে এবারের দুর্গাপূজা।

শোনা গেছে, দীর্ঘকাল ধরে যে মন্দিরে হিন্দুরা দুর্গাপূজা করতেন, সেই মন্দির নাকি সম্প্রসারিত কবরস্থানের অন্তর্গত। অতএব কবর-বিলাসী মুসলীম সম্প্রদায় কার্তিকপুরে একত্রিত হয়, শলায়-পরামর্শে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তারপরই পুজোমন্দির, প্যান্ডেল ধ্বংস হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্যান্ডেলের ধুলোর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার করতালে ওঠা পরিবর্তনপন্থী বোলের গায়ে নামাজ রকমারি রক্ত কুড়িয়ে প্রলেপ লাগাবার পরও রক্তের ভাঁড়ারে টান পড়েনি, কেননা সেকুলারিস্টদের তেলেজলে পুষ্ট বাঙালী মুসলমানদের এবারের লক্ষ্য গ্রেটার বেঙ্গল —বৃহত্তর বাংলাদেশ।

সিপিআই (এম)-এর অত্যাচারে হলদি নদীর জলে নাকি ভেসেছিল লাশ, সিঙ্গুরের নয়নজুলির জল নাকি হয়েছিল লাল— বেলিয়াঘাটা-কার্তিকপুর-বিশ্বনাথপুর-দেগঙ্গার ভারতীয় কুমারীর সম্ভ্রম এবং ভারতীয় মা-বোনের ইজ্জত হরণের সেই অভিযানে ইসলামের ভগিনী মমতা ব্যানার্জীরা শাসনে সভার দিন প্রত্যাহার করার পরও কী দেখেছিলেন? ভরা দুপুরে সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে বেলিয়াঘাটা হতে দেগঙ্গা পর্যন্ত শত শত লুণ্ঠিত হিন্দুর বাড়ীগুলিতে মা-বোনেরা সেদিন ভারতভূমিতে বসেই কেমন চোখের জল ফেলছিলেন? তাদের লাঞ্ছনা, সম্পত্তি হনন এবং সম্ভ্রম খোয়ানোর এক একটি সদ্য সংঘটিত ছবি কেমন করে তাদের চোখের পাতায় ভেসে উঠছিল এবং পরক্ষণেই চোখের জলেই তা হারিয়ে যাচ্ছিল জলের মধ্যেই জলবুদ্বুদের মতো?

ডাকিনী আলোর মতো ধক্ ধক্ করে জ্বলছে সিঙ্গুরের মাটি— জানালার বাইরে কামান দাগার শব্দে ভেঙে ভেঙে পড়ছে রাজারহাট ঃ মমতা ব্যানার্জী জিন্দাবাদ! কিন্তু হিন্দুস্থানে হিন্দুরা? মরণজয়ী সাহসিকতায় কবরীর রক্ত রঙে আকাশ রাঙিয়ে আর কী কেউ সামনে এসে দাঁড়াবে না? তার ডাকে আবিশ্বের লোক ধ্বনিময় হয়ে উঠে আর কী কোনওদিন বলবে না, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, এগিয়ে এসে জোট বাঁধো, হাত মেলাও? জীবনচর্যায় শেকড়ে সত্তায় মহাবৃক্ষের মতো সামনে দাঁড়িয়ে আবার কী কেউ কোনওদিন ডাক দিয়ে যাবে না, হিন্দু, 'তুমি কী পথ হারিয়েছো'?

ভারত সেবাশ্রম
সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

দেশদ্রোহীতার বিরোধিতা করার শাস্তি বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস। হুরিয়ত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান মীরওয়াজ ওমর ফারুকের গত ২৮ নভেম্বর কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখাল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা। আর এই বিক্ষোভের মানবে না। এমতাবস্থায় জেনারেল রায়চৌধুরীর রায়— "বাংলাদেশের বদলা নিতে চাইছে পাকিস্তান। তিনটি যুদ্ধ, ছায়া-যুদ্ধ, জঙ্গি অনুপ্রবেশের পর কাশ্মীরের সাম্প্রতিক অশান্তি পাক-কৌশলের চতুর্থ পর্ব।"

বিদ্যার্থী পরিষদের অন্ততঃ ৫০ জন

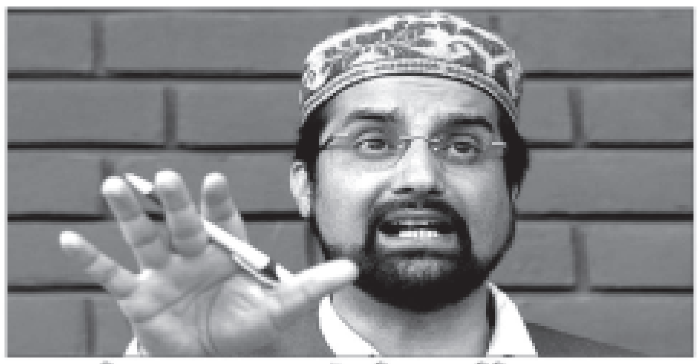

মীরওয়াজ ওমর ফারুক : ফের উস্কে দিয়ে গেলেন বিচ্ছিন্নতাবাদকে

খেসারত হিসাবে তাঁদের গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। সব মিলিয়ে পরিষদের ২২ জন কর্মী গ্রেপ্তার হন। সারা দেশ জুড়ে গিলানী, অরুন্ধতী রায়রা যে ভারত-বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে তারই অঙ্গ হিসেবে মীরওয়াজ আরও একবার ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধেই কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদের স্লোগান-কে জোরদার করে তুলল। তবে এবার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ এল জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর বক্তব্যে। 'সেন্টার অব্ পিস অ্যান্ড প্রোগ্রেস' আয়োজিত আলোচনা চক্রের অন্যতম বক্তা জেনারেল রায়চৌধুরী দাবি তুললেন, 'আপনারা (কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা) যা ইচ্ছে দাবি করুন। কিন্তু সেটা এদেশের সংবিধানের মধ্যে থেকে। আলাদা হওয়া চলবে না।' অন্যদিকে মীরওয়াজ প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছে, যে তারা ভারতের সংবিধান কার্যকর্তা এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। পুলিশ লাঠিচালানায় অনেকেই অল্প-বিস্তর আহত হন। এঁদেরকে অ্যাকাডেমি চত্বরেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এক সাংবাদিক যুবক কৃশানু মিত্র সেমিনার চলাকালীন মীরওয়াজের কাশ্মীর সংক্রান্ত মন্তব্যের অবাঞ্ছিত প্রতিবাদ করলে সংগঠকদের দ্বারাই প্রহৃত হন। পরিষদের রাজ্য সভাপতি রবি রঞ্জন সেন সংবাদমাধ্যমে পাঠানো প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে দাবী করেছেন, ফারুক এবং সংগঠকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রসঙ্গত, চণ্ডীগড়েও এ নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন পরিষদের কার্যকর্তারা। ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ২৯ নভেম্বর হেস্টিংস থানায় পরিষদের রাজ্য সম্পাদিকা পারুল মণ্ডল মীরওয়াজ ফারুকের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করেন।

অবৈধ অর্থই বারোটা বাজিয়েছে দেশের অর্থনীতির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অবৈধ টাকাই এদেশে যত নষ্টের মূল। এই টাকাটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে দেশ থেকে দারিদ্র্য তো উধাও হতোই, সেইসঙ্গে বিশ্বের যে প্রান্তে যেখানে যত ধার ছিল ভারতের, তা পরিশোধও হয়ে যেত। এমনই তথ্য উঠে এসেছে 'দ্য ড্রাইভারস অ্যান্ড ডায়নামিক্স অব্ ইললিসিট ফাইনান্সিয়াল ফ্লোস ফ্রম ইন্ডিয়া ঃ ১৯৪৮-২০০৮' শীর্ষক একটি সমীক্ষায়। সমীক্ষাটি করেছেন অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ দেব কুমার। ইতিপূর্বে ওয়াশিংটন ভিত্তিক অলাভজনক গবেষণা ও পরামর্শদাতা গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক মনিটরি ফান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় এধরনের কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। মনিটরি ফান্ড মূলত বিশ্ব অর্থনৈতিক সংহতির লক্ষ্যে এযাবৎকাল কাজ করে এসেছে। সুতরাং শ্রীদেব-প্রদত্ত 'অর্থনৈতিক তথ্য'কে একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা।

এই তথ্যে দেখানো হয়েছে, ১৯৪৮ থেকে ২০০৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ ৬০ বছরে ভারত প্রায় ৯.৬ লক্ষ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে অবৈধ আর্থিক প্রবাহে (ইললিসিট ফাইনান্সিয়াল ফ্লো)। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, "এই অবৈধ আর্থিক প্রবাহ সংঘটিত হয়েছে মূলতঃ দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম ও ঘুষ, অপরাধমূলক কাজকর্ম এবং দেশের শুল্ক দফতরকে কর ফাঁকি দিয়ে নিজের সম্পত্তি গুছিয়ে নেবার মানসিকতায়।" রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে —ওই অপচয় হওয়া ৯.৬ লক্ষ কোটি টাকার মূল্যমান বর্তমান মূল্যের নিরীখে অন্ততঃ ২১ লক্ষ কোটি টাকা হবে।

রিপোর্টে আর্থিক সংস্কারের সময়সূচক হিসেবে অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের জমানা (১৯৯১—১৯৯৬)-কে তার সূচনা কাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে, আর্থিক সংস্কার হওয়ায় আগের জমানায় দেশে ব্যাপক আর্থিক বেনিয়ম হয়েছে। কিন্তু সংস্কার পরবর্তী যুগে (১৯৯১—২০০৮) বাণিজ্যিক উদারীকরণ ভারতীয় অর্থনীতি থেকে অবৈধ অর্থ বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এতে দেশের অর্থনীতি আদৌ কতটা লাভবান হয়েছে? প্রসঙ্গত, আর্থিক উদারীকরণ অর্থমন্ত্রী মনমোহনের আমলে শুরু হলেও তা চরম উৎকর্ষ লাভ করে এন ডি এ আমলে। ভারতে একমাত্র এন ডি এ-ই সংসাহস দেখিয়ে 'বিলগ্নীকরণ' মন্ত্রক চালু করেছিল। তা যে দেশকে শক্ত আর্থিক বুনিয়াদের ওপর দাঁড়া করাতে সাহায্য করেছিল একথা বিজেপি-বিরোধীরাও স্বীকার করে নেন।

তবে শ্রী দেব কুমারের সমীক্ষা জানাচ্ছে, সংস্কার পূর্ব ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক যুগে (১৯৪৮—১৯৯১) যে পরিমাণ অবৈধ টাকা ভারতবর্ষে দাপিয়ে বেড়িয়েছিল, সংস্কার পরবর্তী সময়ে স্রেফ ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল অবধি প্রায় সমপরিমাণ অবৈধ অর্থ ভারতের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ২০০২ সাল থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ভারত অন্তত বাৎসরিক ৭২,০০০ কোটি টাকা খুইয়েছে অবৈধ আর্থিক প্রবাহের কারণে।

শ্রীদেব কুমারের সমীক্ষায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেসী শাসনেই ভারতের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা। আর বর্তমান কংগ্রেসী জমানায় আর্থিক কেলেঙ্কারী নিশ্চিতভাবেই এই সমীক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করবে।

Swastika
6 December - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

কবিতা জীবনানুভূতির নান্দনিক রূপ

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সংস্কৃত কবি ডঃ সীতানাথ আচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কবি হিসেবে যিনি বড় তিনি শব্দকে নিরন্তর মসৃণই করেন না, কারণ তিনি জানেন কবিতা শুধু শব্দ ও ছন্দের চাতুরী নয়। শব্দের চাকচিক্য কিছুকাল পাঠকের কাছে আকর্ষিত হতে পারে, কিন্তু কালের সীমা অতিক্রম করে মানুষের অন্তরকে তা জয় করতে পারে না। কবিতা শুদ্ধ শব্দ নয় আবার অশুদ্ধ শব্দও নয়—একথা নির্বিবাদে বলা যায়। কবিতা একটি গভীর জীবনানুভূতির নান্দনিক রূপ। এই জীবনানুভূতিকে ধারণ করতে গিয়ে শব্দ যখন সেই অনুভূতিতে লীন হয়— শব্দ তখনই কবিতা হয়। কবির যাত্রা এক দুর্গম পথে। কবির সিদ্ধি জীবনের গভীরতম অনুভূতিটিকে অন্য মানুষের চেতনায় সঞ্চার করা। এ বিষয়ে ডঃ সীতানাথ আচার্য সফল। ডঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন, 'সংস্কৃত কবিতামাত্রই প্রাচীন বলে অনেকের ধারণা, কিন্তু একালেও যে সংস্কৃত কবিতা রচিত হয় তা আমরা অনেকেই জানি না।' আধুনিক সংস্কৃত কাব্য রচনায় সীতানাথ অনন্য এটা আজ সকলেই স্বীকার করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার 'রাসন' গ্রামে সীতানাথের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১ ডিসেম্বর। পণ্ডিত জয়নারায়ণ আচার্য তাঁর পিতা। জন্মসূত্রেই অর্জন করেছিলেন পণ্ডিতবংশের মহার্ঘ্য

লেখকের রচিত গ্রন্থাবলী।

উত্তরাধিকার। ১৯৬১ সালে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করার পর সংস্কৃত কলেজে অনার্স সহ সংস্কৃত বিষয়ে বি এ-তে ভর্তি হন। ১৯৬৬ সালে বি এ এবং ১৯৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীত এম এ পাশ করেন। ১৯৮৩ সালে 'ভারবি মাঘকৃত কাব্যয়োঃ সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবনে ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে লেকচারাররূপে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালে রীডার এবং ১৯৮৮-তে গোপীনাথ কবিরাজ অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেন।

২০০৪-এ অবসর গ্রহণের পর বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের Indological Studies and Research বিভাগে অতিথি অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছেন।

ভাববিলসিতম্, শিশু-যুব-দুর্দৈর্ব বিলসিতম্, কা ত্বং শুভে সহ তাঁর মৌলিক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে চারটি। মৌলিক কবিতার সংখ্যা তিন শতাধিক। সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও অসংখ্য। স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজ তাঁকে দিয়েছে শাস্ত্রী উপাধি। ভারতীয় বিদ্যাভবন ও অন্যান্য বহু সংস্থা তাকে সম্মান জানিয়েছে।

কত ধরনের কাব্য সৃষ্টি করেছেন সীতানাথ। সারস্বত চর্চায় যেহেতু তিনি বৈচিত্র্যের সন্ধানী তাই তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে নানা প্রসঙ্গ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা যেখানে মাধ্যম সেখানে কাব্যের মান উন্নত হলেও স্রষ্টা থেকে গেছেন অজানা।

সংবর্ধিত হচ্ছেন সীতানাথ আচার্য। বাঁ দিকে ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ, ডান দিকে কে ভি গোপালকৃষ্ণণ।

রাষ্ট্রীয় কবি সম্মেলনে সীতানাথ আচার্যকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন দ্বিবেদী রেবাপ্রসাদ সতপথী।

প্রকাশিত হবে ১৩ ডিসেম্বর, '১০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৩ ডিসেম্বর, '১০

বিশেষ প্রসঙ্গ : কাশ্মীর

কাশ্মীরে সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, অশান্তির মূলে ৩৭০ ধারা, আন্তর্জাতিক পাশাখেলা (ষড়যন্ত্র), জঙ্গি নাশকতা, গৃহহারা কাশ্মীরী পণ্ডিতরা, জম্মুতে হিন্দুদের উত্তাল আন্দোলন—এমনই সব বিষয় আর বিশ্লেষণে ঠাসা, তথ্যসমৃদ্ধে ভরপুর, সবমিলিয়ে সংরক্ষণযোগ্য একটি সংখ্যা।

।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ পাঁচ টাকা।।

ফিলিপিন্সে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া ফিলিপিন্সের মাটিতেও বেশ সজীব। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। সেখানকার শিল্প-সামগ্রী, ভাষা, উৎসব, স্থানের নাম ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে মিশে আছে ভারতের ঐতিহ্য। বহন করে চলেছে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা। ভারতীয় রীতিনীতির এই অনুকরণ গত দু' শতাব্দী ধরে ফিলিপিন্সবাসীদের বিশেষত ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের জীবনধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে।

সাম্প্রতিক একটি তথ্য অনুযায়ী ফিলিপিন্সের হস্তশিল্প ও প্রাচীন মুদ্রার দিকে লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে ভারতের প্রভাব। এমনকী সেখানকার জাতীয় ফুল হচ্ছে ভারতের চাঁপা (চম্পা) ফুল। ফিলিপিন্সের একজন প্রধান বিচারপতি রমুলডেজের কথায় "আমাদের আঞ্চলিক ভাষার উৎপত্তি ঘটে দ্রাবিড়িয়ানদের থেকে।" একই অভিমত পোষণ করেন ফিলিপিন্সের গবেষক মহলও। তারা জানান 'ফিলিফিন্সের লিপির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত লিপিগুলির এক অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।'

উৎসবের দেশ ভারতবর্ষ, তাই ভারতীয় উৎসবের রেশও লেগেছে ফিলিপিন্সের জীবনধারায়। ফিলিপিন্সের বহু সামাজিক রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরা পড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ছায়া। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় গবেষক সালেবি জানান, "লানাও ও মিন্ডানাওয়ের পাহাড়ি উপত্যকা অঞ্চলগুলিতে গেলেই চোখে পড়বে প্রাচীন ভারতের অনেক দেবদেবীর মূর্তি। একটি গণেশমূর্তিরও সেখানে সন্ধান পাওয়া গেছে।"

লেখক সত্যব্রত আর প্যাটেল তার পুস্তক 'সোয়েল অফ ইন্ডিয়া'তে বলেছেন, ফিলিফিন্সের মাটিতে ভারতের প্রভাব বিস্তারের সূত্রপাত ঘটে হিন্দুরাজা শ্রীবিজয়ের ১৫০ বছরের রাজত্বকালে।

স্থানীয় সূত্রানুযায়ী সেখানকার মানিলাবে ও লাজোনের তীরবর্তী বেশ কিছু স্থানের নামের উৎপত্তিও ঘটেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব আজ বিশ্বের বহু দেশেই লক্ষ্য করা যায়। ফিলিপিন্স তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com